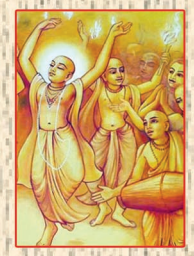

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাকরণ
—পৃঃ ১৫

স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

গল্প লিখেছেন

সুজিত রায় • রন্তিদেব সেনগুপ্ত
শেখর সেনগুপ্ত • পার্থসারথি গুহ
সন্দীপ চক্রবর্তী

৭২ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ৯ মার্চ, ২০২০।। ২৫ ফাল্গুন - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

রঙিয়ে তোলার উৎসব

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ২৫ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৯ মার্চ - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

দিল্লির ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : এবার কেন্দ্র চায়ের দোকান
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

রাইসিনা ও তাজ দর্শনের বাইরে ট্রাম্পের বাণিজ্যিক লেনদেনের হদিশ পাওয়া যাবে ▯ চিদানন্দ রাজঘাট্টা ▯ ৮

বিভ্রান্তি কতদূর যেতে পারে? ▯ গৌতম কুমার মণ্ডল ▯ ১১

সাধারণ হয়েও অসাধারণ ছিলেন পরমেশ্বরনজী
▯ ড. আর বালাশঙ্কর ▯ ১৩

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাকরণ ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ১৫

আদর্শ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ▯ সমীর চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৮

গল্প : আত্মহত্যা ▯ সুজিত রায় ▯ ২৩

গল্প : মেঘমল্লার ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৬

রেঙে ওঠা ও রাঙিয়ে তোলার উৎসব
▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ২৮

গল্প : আত্মপ্রকাশ ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩১

গল্প : শব্দছকের বিশ্বজয় ▯ পার্থসারথি গুহ ▯ ৩৫

গল্প : চিরসখা হে ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৮

ওয়েসির সভায় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান
▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪২** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪৪-৪৫** ▯ **চিত্রকথা : ৪৬**▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯** ▯ **শব্দরূপ : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১৬ মার্চ
২০২০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৬ মার্চ
২০২০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দিল্লিতে পরিকল্পিত দাঙ্গা

দিল্লির দাঙ্গা প্রসঙ্গে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বলেছেন, শাহিনবাগে রাস্তা আটকে প্রতিবাদ যদি সংঘটিত হতে না দেওয়া হতো তা হলে দিল্লির দাঙ্গা ঠেকানো যেত । প্রাক্তন এই আই পি এসের মন্তব্য থেকে অন্য একটি প্রশ্নে জন্ম হয়। দিল্লির দাঙ্গা কি পূর্ব পরিকল্পিত? দিল্লি পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্ট অন্তত তাই বলছে। এরপর যদি শরজিল ইমাম, আমানুতুল্লা, তাহির হোসেন এবং ওমর খালিদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— দিল্লির দাঙ্গা। বাম, কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির নেতারা কীভাবে দাঙ্গার পরিকল্পনা করেছিলেন, জানাবেন সুজিত রায়, দেবযানী ভট্টাচার্য এবং দেবাশিস লাহা।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank -
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নূতন আশার সঞ্চার হউক

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। বসন্তের সমাগমে কবি এমন কথাই বলিয়াছিলেন। বসন্ত নূতন প্রাণের বার্তা বহিয়া আনে। জীর্ণ পুরাতনের অবসানে নবজীবনের আগমনী বার্তা বহিয়া আনে বসন্ত। এই বসন্তেই বঙ্গদেশে সংকীর্ণতা এবং কদর্যতার আবরণ ছিন্ন করিয়া সনাতনী হিন্দুত্বের ধারায় এই মর্ত্যভূমিকে আলোকিত করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। যুগের প্রয়োজনে এক একজন মহাপুরুষ এক একসময় আবির্ভূত হন। শ্রীরামচন্দ্র হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ যুগের প্রয়োজনেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও এই ভারতবর্ষে যুগের প্রয়োজনেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যুগের প্রয়োজনে ধরাধামে আবির্ভূত হওয়া এই মহাপুরুষরাই যুগাবতার। যুগাবতার শ্রীচৈতন্য যখন এই বঙ্গভূমে আবির্ভূত হন, তখন বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশে সত্যই দুর্যোগের ঘনঘটা। ওই সময় বহিরাগত মুসলমান শাসকদের পদানত সমগ্র বঙ্গভূমি। হিন্দুর সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম সবকিছুই সেই সময় লাঞ্ছিত হইতেছে মুসলমান শাসকদের হস্তে। প্রতিনিয়ত হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হইতেছে, হিন্দু নারীগণকে অপহরণ করা হইতেছে, হিন্দুদিগকেও বাধ্য করা হইতেছে ধর্মান্তরকরণে। ইহারই পাশাপাশি হিন্দু সমাজও তখন গোঁড়া রক্ষণশীলতায় আক্রান্ত। নানাবিধ কু-আচার এবং জাতপাতে হিন্দু সমাজ তখন বিভক্ত। হিন্দু সমাজে সেই সময় একতার চিহ্নমাত্র নাই। এককথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, হিন্দু জাতির তখন এক মহাসংকটের সময়। এইরূপ এক মহাসংকটের সময়ই বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। যদি সেই সময় তাঁহার আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে বঙ্গদেশে আজ হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ। ইতিহাসের ওই কলঙ্কময় অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য হরিনামে সমগ্র হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাবতীয় কু-আচার এবং ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার বার্তা দিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই নেতৃত্বে প্রথম বহিরাগত মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিল। সেই প্রতিরোধের সামনে হিন্দু বিদ্বেষী মুসলমান শাসক মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বসন্তে দোলপূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমময় লীলাকীর্তনের পাশাপাশি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের চরণেও আভূমি প্রণত হইবার দিন।

যুগে যুগে, কালে কালে কবিরা বসন্তকে সৌন্দর্যের কাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পত্রেপুষ্পে সজ্জিত হইয়া, নানা রঙে রঙিন হইয়া বসন্ত বারেবারে ধরা পড়িয়াছে কবির চক্ষে। এই বসন্তেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাহার সহচর-সহচরীদের সঙ্গে রঙের খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। আজও তাহা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিধন্য বৃন্দাবন হইতে সমগ্র দেশ, দোল পূর্ণিমার দিন রঙের খেলায় মাতিয়া উঠে। এই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনও মাতিয়া উঠে রঙের উৎসবে। সংবৎসরের যাবতীয় জীর্ণ পুরাতনকে বিদায় জানাইয়া, নূতনকে আহ্বান করে। এই বসন্তেই নবীনকে আবাহন করিয়া কবি বলিয়াছিলেন, 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' আমরাও প্রার্থনা করি, বসন্তের আগমনে যাহা কিছু মলিন তাহা ঘুঁচিয়া গিয়া, নবজীবনের প্রকাশ ঘটুক। নূতন আশার সঞ্চার হউক। নূতন আলোয় আলোকিত হউক ধরণী। মিথ্যার অবসান ঘটুক। সত্য প্রকাশিত হউক।

সুভাষিতম্

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্।।

নিত্য সংস্কারযুক্ত জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিদের যাঁরা সেবা করেন তাঁদের আয়ু, বিদ্যা যশ ও বল—এই চারটি গুণের বিকাশ হয়ে থাকে।

দিল্লির ঘটনা পূর্বকল্পিত?

বিশ্বামিত্র

বিরোধীরা ভুল বোঝানোয় সিএএ নিয়ে দিল্লিতে উত্তেজনা ছিলই। কিন্তু এক পুলিশ কনস্টেবল ও আধিকারিকের মৃত্যু পরিস্থিতির তৈরি হয়নি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের মুহূর্তে এই ঘটনায় ভারতের আতিথেয়তায় কলঙ্ক পড়ল। ঠিক এটাই চেয়েছিল কমিউনিস্টরা। অন্য রাষ্ট্রের দালালি তাদের মজ্জাগত। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সন্দেহের বাতাবরণকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ভারত সফরে এলেন তখন তার নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার জন্য খোদ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ হরেক আয়োজন করেছিল। তা সত্ত্বেও যেখানে মাছি গলার উপক্রম থাকে না, সেখানে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হলো কীভাবে? সবাই এও জানে মার্কিন প্রশাসনে যেই থাকুন না কেন, আসল চাবিকাঠিটি থাকে সিআইএ-র হাতে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে ট্রাম্পের ভারত সফরের সময় এই গণ্ডগোল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ইচ্ছাকৃত নয়তো?

বিশ্বামিত্র-র কলম

বেশ কয়েকবছর আগে, এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক জনৈক জাল পিএইচডি-ধারী উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন সেই ব্যক্তিটি আদতে সিআইএ-র চর। তিনি উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তিটি আমেরিকায় গেলে কীরকম খাতির যত্ন পান এবং দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে তার কীরকম দহরম-মহরম। সেই ব্যক্তিটিকে আমরা একজন বামপন্থী হিসেবেই জানি যিনি মোদী সরকারের সমালোচনায় সর্বদা সরব। একথাও আমাদের অজানা নয় আমেরিকায় প্রবাসী অনেক তথাকথিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্ব সিআইএ-র মদতে ভারতকে হেয় করবার কতরকম মতলব ভাঁজেন।

তাছাড়া ট্রাম্প যেভাবে মোদীর গুণগানে মুখরিত হয়ে ভারতকে প্রশংসিত করেছেন তাতে সিআইএ এবং তাদের বিশ্বস্ত অনুগামী বামপন্থীদের খুশি না হওয়ারই কথা। ফলে দিল্লির এই পরিকল্পিত উত্তেজনাকর পরিস্থিতির জন্যই তারা অপেক্ষায় ছিল এবং এটা তাদের সুচতুর পরিকল্পনার অঙ্গ হওয়াও বিচিত্র নয়। এখন প্রশ্ন হলো, এর শেষ কোথায়? একথা মানতেই হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সিএএ বিরোধী বিক্ষোভকে কড়া হাতে দমন করতেই হবে। সিএএ-তে নাগরিকত্ব বাতিলের কোনো বিষয় না থাকলেও বিরোধীদের অপপ্রচারে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। একে বাড়তে দেওয়া আর কোনো মতে উচিত হবে না। এতদিন বামপন্থীরা দিল্লিতে কেজরিওয়ালের জয়কে নিজেদের জয় হিসেবে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছিল, যদিও তাদের সম্মিলিত ভোট শতাংশ ছিল ০.৩। কেজরিওয়াল কেন্দ্রের পরিস্থিতি শান্ত করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বসায় বামপন্থীদের গাত্রদাহ হয়েছে। আমাদের ভারতীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এটা স্বাভাবিক ব্যাপার কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করবেন। কিন্তু একমাত্র কেরল বাদ দিয়ে আর সব জায়গা থেকেই বামপন্থীদের মানুষ কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করেছে। কেরলেও নিভু নিভু অবস্থা। তাই চিরকাল বিদেশের দালালি করে আসা কমিউনিস্টরা বিদেশের মদতে যে ভারতকে অশান্ত করতে চাইবেন তাতে আর নতুনত্ব কী?

সুতরাং এদের জন্য কড়া পদক্ষেপ নিতেই হবে ভারত সরকারকে। একথা ঠিক যে, জেএনইউ বা যাদবপুরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদের কিছু প্রভাব রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এও অনস্বীকার্য সাম্প্রতিক যাদবপুরে ছাত্র নির্বাচনে বিদ্যার্থী পরিষদ যথেষ্ট ভালো ফল করেছে। একটা কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে হবে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের মূল প্রভাবের কারণ হচ্ছে একটি নকশাল পরিচালিত সংবাদগোষ্ঠী। তারা দিল্লির উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সময়ে মানুষকে কৌশলে বিভ্রান্ত করেছে, দাঙ্গার মদত জুগিয়েছে, সর্বোপরি মিথ্যা খবর ছড়িয়েছে। এই সংবাদমাধ্যমটিকে আমাদের বামপন্থীদের প্রচারযন্ত্র হিসেবেই দেখা উচিত। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের মর্যাদা এটি পেতে পারে না কোনো মতেই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন কলকাতায় আসেন তখন তৃণমূলের মদতে সিপিএমের হুলিগানরা রাস্তায় নেমে অসভ্যতা করেছিল। পুলিশ যথারীতি দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকায়। সুতরাং সাধারণ মানুষকেই সচেতন হতে হবে নয়তো ৪৬-এর 'The Great Calcutta Killing'-এর দিনগুলো অচিরেই ফিরে আসবে।

এবার কেন্দ্র চায়ের দোকান

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

সামনে নতুন দিন আসছে। সকাল বা বিকেলের চা আর শান্তির থাকবে না। আড্ডায় এবার শুনতে হবে দিদির অনুপ্রেরণার কথা।

চায়ের দোকানে রাজনৈতিক আড্ডা। এই বঙ্গে এ খুবই চেনা ছবি। এখন সেই ছবি অনেকটা ফিকে হয়ে গেলেও বাম জমানায় চায়ের দোকান মানেই ছিল 'গণশক্তি' হাতে সিপিএম কর্মীদের আড্ডা। সেখানে বসে চা-প্রেমীদের রাজা-উজির মারা আড্ডাকে ছাপিয়ে যেত রাজনৈতিক আলোচনা। 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত' থেকে 'কেন্দ্রের বঞ্চনা'— এ নিয়ে চায়ের ভাঁড়ে তুফান তুলতেন বামকর্মীরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এখন আবার সেই ছবি ফিরিয়ে আনতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের কথা সাধারণের কাছে বেশি করে পৌঁছে দিতে চায়ের দোকানকেই নতুন করে পলিটিক্যাল প্লাটফর্ম বানাতে চাইছেন। ইতিমধ্যেই তিনি তেমন নির্দেশ দিয়েছেন দলের কর্মীদের।

সাধারণ ভাবে এটাকে দলের হয়ে কথা বলা মনে হলেও বাম আমলে সে ছিল রীতিমতো পরিকল্পিত। সাতের দশকের শেষ ভাগ থেকেই এই 'ক্যাম্পেন' চলত চায়ের দোকানে। একদল উঠে যেতে না যেতেই চলে আসত আর একদল। ফের শুরু হয়ে যেত দলের হয়ে সওয়াল। কখনও কখনও সেই সওয়ালের সঙ্গে বিরোধী পক্ষের জবাবে বদলে যেত ছবি। চায়ের দোকানের উত্তাপ পৌঁছে যেত লোকাল কমিটির অফিসে।

নয়ের দশকের শেষ ভাগেও এই 'চায়ে পে চর্চা' বজায় রেখেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বাম কর্মীরা। ছবিটা হালকা হতে শুরু করে নতুন শতাব্দীর গোড়া থেকেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান, চায়ের দোকানের আড্ডায় 'সিঙ্গুর', 'নন্দীগ্রাম' বিষয় হয়ে ওঠার সময় থেকেই চায়ের দোকানের কমরেডরা একটু একটু করে পিছু হঠতে শুরু করেন। আর পরিবর্তনের বাঙ্গলায় একেবারেই কোণঠাসা হয়ে যান চায়ের দোকানের বাম রাজনীতিকরা।

এখন তৃণমূল কংগ্রেসকর্মীরা যে একেবারেই চায়ের দোকানে আসর মাতান না তা নয়। তবে সেটা খুব একটা সংগঠিত ভাবে নয়। এবার সেটাই চালু করতে চান তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে কর্মীসভা থেকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, প্রতিদিন দু'টি করে চায়ের দোকানে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে দলের বক্তব্য। বামফ্রন্ট সরকার কী পারেনি, আমরা কী করেছি আর বিজেপি কীভাবে দাঙ্গা করছে— সব বলতে হবে চায়ের দোকানে বসে। মানে মিথ্যের ফুলঝুরি ফোটাতে হবে।

চায়ের দোকান যে জনসংযোগের একটা বড়ো ক্ষেত্র তা নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোই জানেন। এই তো কিছুদিন আগে দীঘায় কর্মসূচি সেরে ঢুকে পড়েছিলেন এক অখ্যাত চায়ের দোকানে। না, সেখানে আসর জমাননি তিনি কিন্তু নজর কেড়ে নিয়েছিলেন নিজে হাতে চা বানিয়ে এবং পরিবেশন করে। জনসংযোগের সেই কায়দা এবার কর্মীদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে চান দিদি।

এটাকে সাধারণ কর্মসূচি মনে করার কোনও কারণ নেই। দিদি আসলে লড়াই চাইছেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ে সাধারণের থেকে দিদি এবং দিদির দল যে দূরে চলে গিয়েছে সেটা দিদি বুঝেছেন। এবার সেটায় কর্মীদের নামাতে চাইছেন। সুতরাং, নতুন যুদ্ধের দিন শুরু হতে চলেছে।

দিদি সেই থিয়োরি প্রয়োগ করতে চাইছেন। বারবার একই মিথ্যে বলতে থাকলে কেউ না কেউ বিশ্বাস করবেন। দিদি সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে সেই কাজটাই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে হালে পানি না পেয়ে এখন চায়ের দোকানই তাঁর ভরসা।

—সুন্দর মৌলিক

রাইসিনা ও তাজ দর্শনের বাইরে ট্রাম্পের বাণিজ্যিক লেনদেনের হদিশ পাওয়া যাবে

অতিথি কলম

চিদানন্দ রাজঘাট্টা

ট্রাম্পকে ব্যবসায়িক লেনদেনের গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠে আমেরিকায় নিজের স্বার্থেই ভারতকে সমর্থন দিতে হবে। করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে 'নমস্তে ট্রাম্প' অনুষ্ঠান মঞ্চে মোদী-ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন নিশ্চিত উভয় দেশের সম্পর্কের উষ্ণতার প্রামাণ্য সাক্ষী। মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রথম ভারত সফরের প্রথম দিনটি মানবিক সম্পর্ক নির্মাণের প্রচেষ্টায় তাই ছিল ভরপুর।

দ্বিতীয়দিনে তুলনায় সরকারি আচার অনুষ্ঠানের বাধ্য বাধ্যকতা মেনে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে ব্যবসায়িক ভঙ্গির পারস্পরিক করমর্দন ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খতায় ব্যয়িত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের শরীরী ভাষা, আপাত মানসিক নৈকট্য প্রদর্শন, একে অপরের ভূয়সী প্রশংসার বাক্যজাল নতুন করে দু'দেশের মধ্যে একটি স্থায়ী, শক্তিশালী ও এযাবৎ অনুপস্থিত এক অভূতপূর্ণ সম্পর্ক নির্মাণেরই ইঙ্গিতবাহী।

অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভারত-মার্কিন সম্পর্ক তৈরির প্রশ্নে বরাবরই এক ধরনের বিপদে আঁচ করে নেওয়া হতো। এমন কী খুব নিরাপদ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এ নিয়ে জল্পনা কখনও শেষ হতো না। আমেরিকার সন্নিকটের বেশিরভাগ দেশের মধ্যে আবার এ নিয়ে ভগবানকেও টেনে আনার চেষ্টা চলত। কেননা অধিকাংশ সময়ই চুক্তি প্রায়ই হতো বিষম বা অসম চুক্তি। উদাহরণ দিয়ে এক মেক্সিকান নেতার কথা বলা যায়। তিনি পরিতাপ করে বলেছিলেন, 'হায়রে! আমরা ভগবানের থেকে কত দূরেই না রয়ে গেলাম অথচ আমরা আমেরিকার কত কাছেই না থাকি।' অর্থাৎ তাদের পক্ষে আমেরিকা কোনো সুবিধেজনক চুক্তিতে যায়নি। অন্যদিকে কানাডাবাসীরা আবার উৎফুল্ল। তারা বলছে নিশ্চয় ঈশ্বর আমেরিকাকে উজাড় করে আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন, তবে আমাদের দুঃখ নেই ঈশ্বর আমাদের আমেরিকার সঙ্গী হয়ে থাকতে সাহায্য করে থাকেন।

ওয়াশিংটন সবসময়ই একজন সর্ব বিষয়ে শেষ কথা বলা অথচ সকলেরই কাঙ্ক্ষিত বন্ধু হিসেবে থাকলেও সমগ্র বিশ্বের ওপর তার প্রাধান্য যারা মেনে নেবে তাদেরই বেশি পছন্দ করে। এই দর্শনটি ট্রাম্পের আমলে আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে 'আমেরিকা ফার্স্ট' এই আপ্তবাক্যটির মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে যদি এমনটা কেউ ধরে নেন যে আদতে আমেরিকার পছন্দের মানুষ হওয়ার চেয়ে তার উপেক্ষা মেনে নেওয়াটাই শ্রেয় সেক্ষেত্রে বলতে হবে গত ৫০ বছরে ভারত কিছুটা ভাগ্যবানই ছিল। কেননা এই সময়টায় মার্কিনীরা ভারতকে তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে আনেনি।

> "বিশ্বে এখন চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রু কেউ নয়। কিন্তু নিজ নিজ দেশের স্বার্থ চিরস্থায়ী। এতদ্‌সত্ত্বেও পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতার আবহে একটি দীর্ঘস্থায়ী মজবুত সম্পর্ক গড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিস্থিতি অবশ্যই তৈরি হয়েছে। মোদী ও ট্রাম্প কেউই বরাবর নেতৃত্বে থাকবেন না, কিন্তু উভয় দেশের মানুষ থাকবে। তারা এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়।"

১৯৯০-এর শেষাশেষি থেকে অবস্থাটা বদলানো শুরু হয়। বিগত ২২ বছরে পরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা দেশকে আমেরিকা ঘনিষ্ঠ করে তোলার প্রয়াস শুরু করেন। এর মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়কাল ধরে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে ব্যবধান তথা শীতলতা ছিল বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যকালের শুরু থেকেই তা বদলাতে উঠে পড়ে লাগেন।

আলিঙ্গনের চাক্ষুষ হওয়া তৃপ্তিদায়ক দৃশ্যগুলির অভ্যন্তর কিন্তু অন্তঃসারশূন্য নয়। এর অন্তরালে বরং রয়েছে বিগত বেশ কিছু সময় ধরে ভারতের একটি সম্ভবনাময় শক্তিকেন্দ্র হয়ে ওঠা। একই সঙ্গে উভয়দেশের জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সুসম্পর্কের ধারবাহিক বৃদ্ধি। মনে করা যায় ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় যখন ভারতকে মূলত সোভিয়েত ঘেঁষা দেশ হিসেবেই ধরা হতো তখনও কিন্তু যত ভারতীয় রাশিয়ায় যেত তার চেয়ে ঢের বেশি ভারতীয় আমেরিকামুখী হতো। সেখানে তারা সাগ্রহে গৃহীতও হতো। এরই দীর্ঘকালীন পরিণতিতে আমেরিকা আজ ৪০ লক্ষ এমন ভারতীয়ের আবাসস্থল যারা সে দেশটিকে নিজেদের কর্মভূমি বলে মনে করে। এর সঙ্গে বছরের যে কোনো সময়কে রেনডম হিসেবে ধরলে ২ লক্ষ ভারতীয় ছাত্র সেখানে পড়াশোনা করে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশই এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে গ্রহণের পর তাদের নিজ দেশে স্থায়ী বসবাসকারী হিসেবে মান্যতা দেয়নি। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে বিশ্বের সর্ব প্রসিদ্ধ মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি Microsoft, Google বা IBM-এর আজকের কর্ণধাররা জন্মসূত্রে সকলেই ভারতীয়।

এতদ্ সত্ত্বেও, ভারত-আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিন্তু পূর্ণভাবে বিকশিত

হতে পারেনি। যেটা হওয়া আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে যদি প্রতিতুলনা করা যায়। উল্লেখিত সময়টায় কিন্তু ভারতে অতি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল। অথচ চলতি শতাব্দীর শুরুতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের যে বহর ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার তা উলম্ফন দিয়ে ২০১৫ সালে এসে ১০০ বিলিয়ন ডলার ছুঁয়ে ফেলে। কিন্তু আমেরিকা এই নাগাড়ে বৃদ্ধি ও ভারতের উন্নয়নকে যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে গিয়ে ভারতকে একটি বিশ্ব শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠার পথে কৌশলগত সহযোগিতায় বিরত ছিল। তারা সেভাবে ভাবেনি যে চীনের মহাশক্তিধর হয়ে ওঠার বিপরীতে মার্কিন সহযোগিতায় ভারতও প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে আসতে পারে।

বাস্তবে ওবামা-বিডেন-কেরি-ক্লিন্টন আমলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলার করার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও তা সুদূর পরাহত থেকে যায়। যেমন ভারতের ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠা নিয়ে অনেকে নিরাশা ব্যক্ত করছেন। এই বিতর্কিত বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যিনি নিজে একজন সফল উচ্চাভিলাষী শিল্পবান্ধব ও দ্রুত ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনে সিদ্ধহস্ত বলে নিজেকে উপস্থাপিত করেন তিনি কি সফল হবেন?

অবশ্যই তিনি সফল হওয়ার ক্ষমতা ধরেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভারত একপক্ষীয় ভাবে চীনের মতো অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক বস্তু তাঁর কাছ থেকে কিনে বাণিজ্য ঘাটতি ভরাট করে দেবে। এটাই কিন্তু তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ মনোবাঞ্ছার মধ্যে পড়ে। নিজের ভাবমূর্তি অটুট রাখতে ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এই ভারত সফর নিঃসন্দেহে তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু আরও মজবুত সম্পর্ক তৈরি করতে গেলে অর্থনৈতিক বিষয়টি উভয় দেশের পক্ষেই মঙ্গল তথা লাভজনক হওয়া দরকার।

এই নিরিখে 'আমেরিকা ফার্স্ট' ও 'বিশ্বশক্তি হিসেবে আমেরিকাই প্রধান' এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মেক ইন ইন্ডিয়া ও নতুন দিল্লিরও বিশ্বের দরবারে শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত সম্মানজনক সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। সে কারণে ভারতের ক্ষেত্রে আমেরিকাকে কিছুটা নমনীয় হতে হবে একই সঙ্গে ভারতের বৃদ্ধিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার ক্ষেত্রে দ্বিধা রাখলে হবে না। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের ক্ষেত্রে হবে ভারতের সর্বপেক্ষা বড়ো সম্পদ দেশের অতি দক্ষ মানবশক্তি।

কথাটা বলা বা সাজেশন দেওয়া সোজা হলেও চা ও ঠোঁটের মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবধান রয়েছে। গোটা বিষয়টিকে কীভাবে কার্যকরী করে তোলা যায় তা নিয়ে চিন্তাস্তরে অনেক প্রভেদ বিদ্যমান। আমেরিকাকে একটা জিনিস মানতে হবে যে সৌহার্দ্যের আদর্শ পরিবেশ তৈরি হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সব সময়ই যে উভয়দেশের মধ্যে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পূর্ণ সহমত তৈরি হবে এমনটা নয়। শক্তি ক্ষেত্রের কথাই ধরা যায়। ট্রাম্পের হাইড্রো কার্বন নিঃসরণ নিয়ে এক ধরনের তীব্র বিরাগ আছে। চলতি সফরের ৩৬ ঘণ্টার (কাজের সময়) পুনর্নবীকৃত শক্তি নিয়ে কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্যও হয়নি। যদি ধরে নেওয়া যায় ২০২০-র নির্বাচনে বা তারও পরে আমেরিকায় আরও একজন একই রকম হাইড্রো কার্বন নিয়ে বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি আমেরিকার সর্বোচ্চ পদে বসলেন সেক্ষেত্রে ভারতের প্রতি অবস্থান কী হবে? হাইড্রো কার্বনের প্রভাবে ভারতের রাজধানী ও সারা পৃথিবীর বহু দেশই যে প্রকাশ্য দিবালোকেও ধোঁয়াসাচ্ছন্ন, ছায়া ছায়া প্রতীয়মান হচ্ছে তা তো তিনি চাক্ষুষ করেই গেলেন। এই অবস্থায় আমেরিকার বন্ধুত্ব অটুট রাখতে renewable energy সংক্রান্ত কোনো আলোচনা না করে বিপুল বিষাক্ত বিষবাষ্পকে বিনা বাক্যে হজম করে কেন ভারত উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে তার সুসম্পর্ক খোয়াবে? বিশেষ করে এদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের অবস্থান সহজ করতে প্রায়শই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেয়।

এরপর দুগ্ধজাত পণ্যের প্রশ্ন। যেহেতু আমেরিকানরা তাদের প্রাচুর্যের সুবাদে আজকাল গোরু মোষের দুধ ও দুগ্ধজাত বস্তু ছেড়ে দিয়ে গাছপালা থেকে উৎপন্ন দুধ খাওয়ার অত্যাধুনিক অভ্যাস শুরু করেছে তাদের দেশে বাড়তি দুধের বন্যা হয়ে যাচ্ছে। প্রচলিত দুধ ব্যবহার ৪০ শতাংশ কমে গেছে। আর আমেরিকার দুধ-রাজধানী Wisconsin-এর ভোট ট্রাম্প নিজের পকেটে আনতে চান। সেক্ষেত্রে ভারত দুধের বোঝা কিন্তু হজম করতে পারবে না। ভারত কঠিন পরিশ্রমে সবে মাত্র দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এগুলি প্রকট সমস্যা এবং এর সমাধান সূত্রে নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ জরুরি। বিশ্বে এখন চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রু কেউ নয়। কিন্তু নিজ নিজ দেশের স্বার্থ চিরস্থায়ী। এতদ্‌সত্ত্বেও পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতার আবহে একটি দীর্ঘস্থায়ী মজবুত সম্পর্ক গড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিস্থিতি অবশ্যই তৈরি হয়েছে। মোদী ও ট্রাম্প কেউই বরাবর নেতৃত্বে থাকবেন না, কিন্তু উভয় দেশের মানুষ থাকবে। তারা এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়।

(লেখক প্রবীণ সাংবাদিক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

রম্যরচনা

কত কষ্ট

স্ত্রী একদিন স্বামীর মদের বোতল থেকে এক ঢোক মদ খেয়ে বলল, 'ইস্, কী জঘন্য খেতে। আর কী ঝাঁঝ। গলাটা জ্বলে গেল। এই বাজে জিনিসটা তুমি রোজ রোজ খাও?'

স্বামী বলল, 'তা হলেই বোঝো আমাকে রোজ কত কষ্ট সহ্য করতে হয়। আর তুমি বলো আমি নাকি মদ খেয়ে ফুর্তি করি।

টিটিএমপি

বল্টু আড্ডায় এক নতুন বন্ধুকে পল্টুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সব শুনে পল্টুদা বললেন, আমাদের এখানে সবাই শিক্ষিত। তোমার পড়াশোনা কতদূর। বন্ধুটি বলল, টিটিএমপি। শুনে সবাই হাঁ হয়ে আছে। পল্টুদা বললেন, সেটা কী? সে বলল, টেনে টুনে মাধ্যমিক পাশ।

হাড়কিপটে স্বামী

এক হাড়কিপটে স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে।

স্ত্রী : এই শোনো, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। এক বোতল জল আনো।

স্বামী : তাহলে কি দই-কচুরি খাবে?

স্ত্রী : এটা শুনেই তো আমার জিভে জল এসে গেছে।

স্বামী : তাহলে ওটাই খেয়ে নাও। আর বোতলের কী দরকার।

উবাচ

"বিজেপিকে রাজধর্ম শেখাতে আসবেন না। হিংসা ছড়ানোতে আপনারা রেকর্ড লঙ্ঘন করেছেন। আয়নাতে নিজেদের মুখটা দেখুন।"

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি তোলায় সোনিয়া গান্ধীর প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে

"আমরা সঙ্ঘের শাখায় প্রতিদিন প্রার্থনা করার সময় ভগবানের কাছে পাঁচটি গুণ প্রার্থনা করি। তার মধ্যে একটি রয়েছে শক্তি। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির শক্তি থাকা যথেষ্ট নয়। শক্তির স্বরূপ সমষ্টিগত হওয়া উচিত। সমাজকে শক্তিশালী করার কাজই করে চলেছে সঙ্ঘ।"

মোহনরাও ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক,
আরএসএস

সম্প্রতি নাগপুরে 'নবোৎসব' সমাবেশের বক্তব্যে

"শাহিনবাগকে সংঘটিত হতে না দিলে এই দাঙ্গা হতো না। এই দাঙ্গার প্রধান কারণ একের পর এক স্লোগান। যা মানুষকে উসকে দিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। রাস্তা আটকে বিক্ষোভ অবশ্যই একটি অপরাধ।"

অজয়রাজ শর্মা
দিল্লির প্রাক্তন পুলিশ
কমিশনার

দিল্লির দাঙ্গা প্রসঙ্গে

"পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় অত্যাচারে যে হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধরা এদেশে এসেছেন তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। মমতাদি কিছুতেই রুখতে পারবেন না।"

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কলকাতা শহিদ মিনারের জনসভায়

বিভ্রান্তি কত দূর যেতে পারে!

গৌতম কুমার মণ্ডল

বিভ্রান্তি কত দূর যেতে পারে সিএএ-কে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তা যেন দেখিয়ে দিচ্ছে। সিএবি সংসদে পাশ হয়ে যাবার পর দেশের বেশ কিছু জায়গায় এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদগুলোর খবর আমরা পাচ্ছি তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখা যাচ্ছে না। আন্দোলন হচ্ছে বিভ্রান্তি ছড়ানোর ও বিভ্রান্তি প্রচার করার জন্যই। সিএএ হয়ে যাবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এখন আর অন্য কোনো অভিযোগ যেন নেই। শুধুই সিএএ। রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সভাসমিতি, পদযাত্রা, অবস্থান বিক্ষোভ সবকিছুই এখন সিএএ কেন্দ্রিক। যেন এই একটি বিষয় ছাড়া দেশে বলার মতো বা ভাবার মতো আর কিছু নেই। এই একটা আইন করে অদূর ভবিষ্যতে বাকি ভারতের কোটি কোটি মুসলমান জনতাকে একে একে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে! তাই চল....আন্দোলন করো, প্রতিবাদ করো, এই ঠাণ্ডায় রাস্তায় রাত জেগে বসে থাক! এগিয়ে আসুক মহিলারা, এমনকী সন্তান কোলে মায়েরা! সঙ্গে নাও জাতীয় পতাকা! দেখাও আমরাও কত দেশভক্ত, আমরাও দেশেরই নাগরিক। এই আন্দোলনে, প্রতিবাদে, জাতীয় পতাকাকেন্দ্রিক এই ভাবনায় সবকিছুতেই চূড়ান্ত বিভ্রান্তি।

বিজেপি বিরোধী প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সমাজ মুসলমানদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে তাদের নাগরিকত্ব এই আইনের বলে খুব সরু সুতোর উপর ঝুলছে। যে কোনো সময় তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণবাহী এই এই ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। প্রমাণ দিতে হবে নাগরিকত্বের। না পারলেই তাদের বলা হবে তোমরা সন্দেহজনক নাগরিক, ডি ভোটার; তাদের এর পর ডিটেনশান ক্যাম্পে পাঠানো হবে এবং তারপর সোজা বাংলাদেশ বা অন্য কোথাও! বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে সভা-সমিতির মাধ্যমে, লিফলেট প্রচারে, উল্টোপাল্টা দেওয়াল লিখনে এবং অবশ্যই সামাজিক মাধ্যমে। বিভিন্ন গোঁড়া ধর্মীয় গোষ্ঠী আর বিজেপি বিরোধী কিছু রাজনৈতিক দল যারা মুসলমানদের শুধু ভোটার করেই রেখেছে তারা নানান সামাজিক মাধ্যমে ছড়াচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বহু ভিডিয়ো। সেগুলো আগুনের মতো ছড়াচ্ছে মুসলমান জনতার হাতে হাতে থাকা মোবাইল ফোনে। কত কিছুই না বলা হচ্ছে সেসব ভিডিয়োয়। আর তাদের মনে ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্বেষের বিষ। এক জায়গায় দেখছিলাম রাস্তার কাজ করছিলেন কিছু শ্রমিক। তারা প্রায় সবাই মুসলমান। দুপুরের খাওয়ার পর তাদের ক্ষণিক বিশ্রাম। সেই অবসরে একজনের মোবাইলে বেজে উঠল এরকম একটি ভিডিয়ো। সবকটা ঘাড় মাথা মোবাইলের কাছে এল। সবাই মন দিয়ে শুনলেন ও দেখলেন সেই ভিডিয়ো। যেন গোগ্রাসে গিললেন। শুনলাম তাতে বলা হচ্ছে কোনো বিজেপি নেতা নাকি বলেছেন সিএবি পাশ হয়ে যাবার পর আর কিছুদিনের মধ্যেই মমতার যারা আসল ভোটার তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়ানো হবে। সবাই থমথমে মুখে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর কেউ বিড়ি ধরাল। তারপর কাজে লাগল। দেশের সম্মাননীয়, সরল ও সাধারণ নাগরিকদের মনে এভাবে ছড়ানো হচ্ছে ভয় আর আতঙ্ক। এই আতঙ্ককে স্থায়ী করারও চেষ্টা চলছে। যেন এই আতঙ্ক নিয়েই তারা ভোটবাক্স অবধি যেতে পারেন। দেশহিতকে বাদ দিয়ে সব কিছুরই পরিমাপ হচ্ছে ভোটের নিক্তিতে। ফলে আন্দোলন আর প্রতিবাদের যেন বিরাম নেই।

> **এ দেশের মুসলমান, যারা এ দেশের সম্মাননীয় নাগরিক তাদের কোনো প্রতিবাদে শামিল হওয়ার দরকারই নেই। ভারতীয়দের জন্য এ আইন নয়ই। তবুও বিভ্রান্তি যেন দুর্নিবার। মানুষের মুখে মুখে, প্রতিবাদ সভার আবোল-তাবোল বক্তৃতায়, মোবাইলে মোবাইলে ভিডিয়োর লেনদেনে এই বিভ্রান্তির ছড়াছড়ি। আশা করি দেশের মুসলমান সমাজ এই বিভ্রান্তি থেকে দ্রুত সরে আসবেন।**

বিভ্রান্তি আর বিদ্বেষ এখন সর্বত্র। সিএএ খুব সরল সোজা একটি আইন। আইনে কোনো জটিলতা নেই। দেশের সংসদের উভয় কক্ষে বহু আলোচনার পর তা পাশ হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিএএ বিষয়ে বহু সাংসদের বহু সংশয়, সংকোচ এবং প্রশ্নের উত্তর সংসদেই দিয়েছেন। পরিশেষে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়েছে। কোনো একটি বিষয়ে রাজনৈতিক কোনো রাজনৈতিক দলের বিরোধ থাকতেই পারে। সংসদে তাঁরা বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি আইনে রূপান্তরিত হবার পর প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উচিত তাকে মান্যতা দেওয়া। নইলে সংবিধানের শাসন বা আইনের শাসনের কোনো মূল্য থাকে না। সিএএ লাগু হয়ে যাবার পর ভোটের রাজনীতির জন্য ও সেকারণেই দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল বলছে আমরা সিএএ মানি না। সংসদে পাশ হয়ে যাওয়া একটি আইনকে মানব না বলে কয়েকটি রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশও হয়ে গেছে। বিভ্রান্তির যেন চূড়ান্ত! একটি আইনকে কেন্দ্র করে এ ধরনের বিভ্রান্তি তথা নৈরাজ্য আগে দেখা দিয়েছে বলে মনে পড়ছে না। এই নৈরাজ্য থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হয়তো বলে দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে দেশের মুসলমানরাও এ দেশের নাগরিক। কোটি কোটি দেশভক্ত মুসলমান জনতাকে বাদ দিয়ে, বিশাল ভারত জুড়ে তাদের অবদানের কথা ভুলে গিয়ে এই ভারতকে কল্পনা করাও যায় না। একথা সবাই বোঝেন। শুধু না বোঝার ভান করেন কিছু রাজনৈতিক দল যারা ধর্মকে কেন্দ্র করেই রাজনীতি করতে চান। স্বাধীনতার আগে থেকেই এ দেশের এই মুসলমান জনতা ধর্মীয় রাজনীতির যুপকাষ্ঠে বন্দি। তাদেরকে নিয়ে শুধু রাজনীতিই করা যায় আর কিছুর যেন দরকার নেই। তাই তাঁরা অশিক্ষিত থাক, ধর্মের কারাগারে বন্দি থাক, আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু সেকেলে মাদ্রাসায় যাক, এই আধুনিক যুগেও ইংরেজি না শিখে

আরবি-ফারসি শিখুক। স্বাধীন ভারতেও এই একই ট্র্যাডিশান চলছে। মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় সচেতন ও শিক্ষিত হলে আজকের ভারতের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের রাজনীতি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই তাদের জন্য মাদ্রাসা খোলা হোক একের পর এক। বৈধ অবৈধ নানাভাবে। এসব কারণেই সামান্য শিক্ষাদীক্ষা নেই। এমনকী আজও অনেকে নিরক্ষর। এরা কিন্তু নানা কর্মে দক্ষ। মাঠে ঘাটে নগরে বন্দরে এরা শ্রমিকের কাজ করেন। রাজমিস্ত্রির কাজে তো এরা বিশেষভাবে দক্ষ। অর্থাৎ নানা দিক দিয়ে এই অশিক্ষিত মুসলমান জনতা দেশ নির্মাণের কাজে নিয়োজিত। কিন্তু তাদের অশিক্ষার কারণেই তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো সহজ। সেইকাজ এখন যেন পুরোদমে চলছে।

সিএএতে বলা হয়েছে খুব সহজ কথা সহজ ভাবে। তা হলো আমাদের প্রতিবেশী তিনটি দেশ আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, পারসি ও জৈন ধর্মের মানুষেরা ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪-র আগে এদেশে এলে ভারত তাদের নাগরিকত্ব দিবে। ওই তিনটি দেশ ইসলামিক দেশ। নানা সময়ে এই দেশগুলিতে ইসলাম ছাড়া অন্যদের উপর বিশেষ করে হিন্দুদের উপর ধর্মীয় নিপীড়ন হয়ে থাকে। একথা সারা বিশ্ব জানে। এই অত্যাচারিত মানুষেরা প্রাণের ভয়ে স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতে আসেন। ভারত কি তাদের অবহেলা করতে পারে? অবহেলা করলে তারা কোথায় যাবেন? আগত মুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা এই আইনে বলা নেই। এতেই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা। নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে এই সরকার ধর্মের বিভেদ করছে কেন? এ তো সংবিধানের পরিপন্থী! গেল গেল রব উঠল চারদিকে। ওই তিনটি দেশ থেকে আগত মুসলমানদের কেন নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য জবাব এরা কেউ দিচ্ছেন না। কিন্তু প্রতিবাদ সভাগুলিতে, দিল্লির শাহিনবাগে বহু ভাষণ হচ্ছে। আসল কথাটাই বলা হচ্ছে না। ওই তিনটি দেশই ইসলামিক দেশ। মুসলমানদের উপর সেখানে কোথাও ধর্মীয় নিপীড়ন হতে পারে না। সেখান থেকে যে মুসলমানরা এ দেশে আসছেন তারা যদি অত্যাচারিত হয়ে আসেন এবং দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন তাহলে তারাও নাগরিক হতে পারেন। কিন্তু অবৈধ উপায়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এদেশে এসে এদেশের নাগরিকত্ব দাবি করবেন এটা তো হতে পারে না। এরা সবাই নাগরিক হলে আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবার জীবন ও জীবিকার উপর কোপ পড়বে। সরকারের সব পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এই সহজ কথাটা সবাই বুঝেও না বোঝার ভান করছেন। শুধু ভোটের স্বার্থে এ দেশের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছেন; আর অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে থেকে যেতে উৎসাহ দিচ্ছেন।

সিএএ সরল ও সোজা আইন। নানা অবান্তর প্রশ্ন তুলে তাকে জটিল করে তুলেছে কয়েকটি রাজনৈতিক দল। অশিক্ষিত ও কম শিক্ষিত মুসলমান জনতার মনে আতঙ্ক তৈরি করে তাদের বিভ্রান্ত করে তুলেছে এই দলগুলি। মুসলমানদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই আইনের বলে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা আতঙ্কিত। আতঙ্কে হাজারে হাজারে মানুষ যাচ্ছেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দরজায় দরজায় আধার কার্ড বানানোর বা সংশোধনের লাইনে। রাত থেকেই লাইন। এমনকী লাইনেই দিন রাত কাটছে! ভোটার কার্ড সংশোধনের লাইনেও ভিড়। ভিড় প্রতিবাদে, অবস্থানে, বিক্ষোভে, জমায়েতে, পদযাত্রায়। একদিন দু'দিন নয়। প্রায় প্রতিদিন। এখানে সেখানে। বসন্ত পঞ্চমীর দিন সিএএ-র বিরুদ্ধে একটা ভারত বনধও হয়ে গেল। বামদলগুলির সাহায্যে বেশ কয়েকটি দল এই বন্ধ ডেকেছিল। কয়েকটি শহরে বনধের ভালোই প্রভাব ছিল। সিএএ-র বিরুদ্ধে ডাকা বন্‌ধে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে গুলি চলল। মারা গেলেন দু'জন। তাদের মধ্যে একজন বছর উনিশের যুবক সালাউদ্দিন শেখ। বিভ্রান্তির যেন চূড়ান্ত। যাঁরা শিক্ষিত মুসলমান বিভ্রান্তি তাঁদের মধ্যেও। দিল্লির শাহিনবাগে মাসাধিক কাল ধরে যাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ করছেন তাঁরা মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণীর। তাঁরা কেউ এ কথাটার উত্তর দিচ্ছেন না যে ওই তিনটি দেশ থেকে আসা মুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে কেন? আর ওই দেশগুলি থেকে ধর্মগত কারণে নিপীড়িত হয়ে সেখানকার যে সংখ্যালঘু মানুষেরা এদেশে এসেছেন তাঁদের নাগরিকত্ব দিলে অসুবিধা কোথায়? এই সহজ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক রাগের প্রকাশ ঘটছে বহু অর্থহীন ভাষণেও। তাঁরা সিএএ-র সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন এনআরসিকে। কোন্ বিজেপি নেতা এন আর সি নিয়ে কোথায় কী বলেছেন, কখন থেকে মুসলমানদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে—এইসব কথা বলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে এনআরসি নিয়ে দিল্লির রামলীলা ময়দানে সরকারের মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন এন আর সি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেটে আজ পর্যন্ত কোনো আলোচনা হয়নি। তাই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার এখন কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কথার তাঁদের কাছে যেন কোনো দাম নেই। অন্য কে কী বলেছেন সে সব কথা বলা হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে আজাদির কথা। কীসের আজাদি, কার আজাদি তাও ঠিকভাবে জানে না। সংবাদমাধ্যম থেকে প্রশ্ন করা হলে উত্তর আসছে মোদীর থেকে আজাদি। এমনকী তিন-চার বছরেরর বালক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু প্রার্থনাও করছে। বার বার মোদী সরকারকে বলা হচ্ছে ফ্যাসিবাদী, ইনটলারেন্ট ও আরও কত কী। কিন্তু সিএএ-কে নিয়ে এদের অভিযোগের সারবত্তা ঠিক কতখানি তা বলা হচ্ছে না। শুধুই মানুষকে প্রতিবাদের নামে হুজুগে মাতিয়ে রাখা হয়েছে। আর এই হুজুগকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে কিছু সংবাদমাধ্যম। তাদের দৈনন্দিন খোরাকির এখন যেন কোনো অভাব নেই।

সরকারের পক্ষ থেকে বার বার বলা হচ্ছে এ দেশের মুসলমান জনতার সিএএ নিয়ে ভাববার কোনো দরকারই নেই। তাদের কোনো ডকুমেন্ট কেউ দেখতে যাবে না। কারণ এই আইন দেশের নাগরিকদের জন্য নয়ই। এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ যারা ধর্মে মূলত মুসলমান এবং যারা অবৈধভাবে দেশের সীমা লঙ্ঘন করে এসেছে এবং এখানে বাস করছে তাদের ফিরে যেতে হবে। কারণ তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে অনেকে ফিরতে শুরুও করেছে। সুতরাং এ দেশের মুসলমান, যারা এ দেশের সম্মাননীয় নাগরিক তাদের কোনো প্রতিবাদে শামিল হওয়ার দরকারই নেই। ভারতীয়দের জন্য এ আইন নয়ই। তবুও বিভ্রান্তি যেন দুর্নিবার। মানুষের মুখে মুখে, প্রতিবাদ সভার আবোল-তাবোল বক্তৃতায়, মোবাইলে মোবাইলে ভিডিয়োর লেনদেনে এই বিভ্রান্তির ছড়াছড়ি। আশা করি দেশের মুসলমান সমাজ এই বিভ্রান্তি থেকে দ্রুত সরে আসবেন ও উপযুক্ত শিক্ষা নেবেন। ■

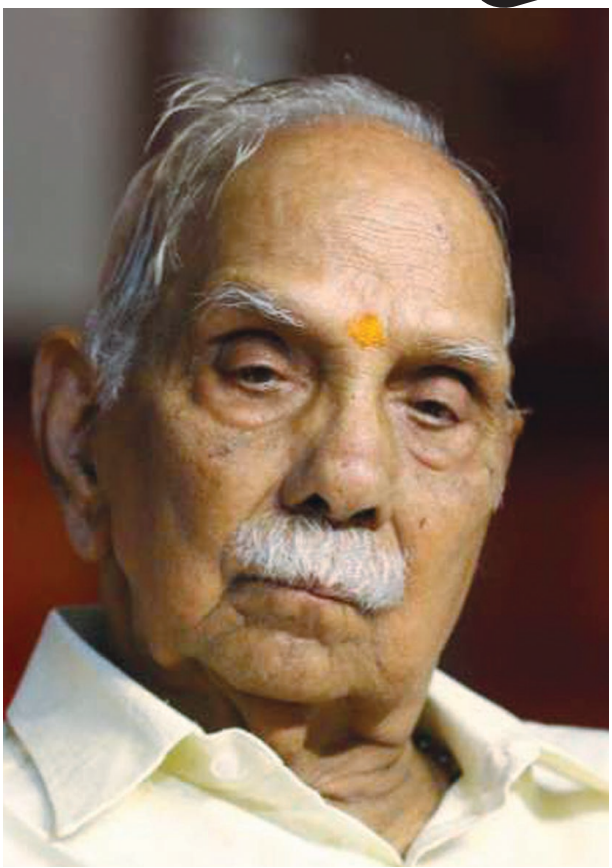

সাধারণ হয়েও অসাধারণ ছিলেন পরমেশ্বরনজী

ড. আর. বালাশঙ্কর

গত ৯ ফেব্রুয়ারি পি. পরমেশ্বরনজীর পরলোকগমনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং তার কেরলের সহযোগী সংগঠনগুলি তাদের সবথেকে প্রিয়, বিখ্যাত, শ্রদ্ধেয়, সর্বজনস্বীকৃত চিন্তাবিদ, তাত্ত্বিক, কবি এবং শিক্ষাবিদকে হারালো।

পরমেশ্বরনজী ছিলেন একজন উঁচুমানের শিক্ষাবিদ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাঁর শিক্ষাগত উৎকর্ষতা স্বীকৃতি পেয়েছিল। ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ, পি. গোবিন্দ পিল্লাই এবং ই.কে. নায়নারের মতো মার্কসবাদীনেতা, কে. করুণাকরণ, এ.কে. অ্যান্টনি, ওমেন চাণ্ডির মতো কংগ্রেসি নেতৃত্ব এবং রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা রমেশ চেন্নিথালা পরমেশ্বরণজীর দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতা এবং ত্যাগের মানসিকতাকে স্বীকৃতি এবং প্রশংসা করেছেন। কেরলের বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে পরমেশ্বরনজীকে 'ঋষি' বলে উল্লেখ করে বলেন তিনি তাঁর দৃঢ়বিশ্বাসের প্রতি স্থির সংকল্প ছিলেন।

পরমেশ্বরনজীর মৃত্যু কেরলের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক ব্যাপক শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। যদিও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখতেন, তথাপি রাজ্যের দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের প্রভাবিত করত। পরমেশ্বরনজী ছিলেন একজন অসাধারণ এবং নিয়মিত লেখক। কেরলের সমসাময়িক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির ওপর তাঁর মন্তব্য সবাই দেখত এবং নিয়মিত তার চর্চা হতো।

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার গঠিত হওয়ার পর তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেন এবং স্বল্প সময়ের জন্য দিল্লিতে দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর পদে ছিলেন। ওই সময় আমার সঙ্গে পরমেশ্বরনজীর ঘনিষ্ঠতা হয়। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় ১৯৬৯ সালে। তিনি তখন ভারতীয় জনসঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারি (সাধারণ সম্পাদক) ছিলেন। কেরলের ছোট্ট শহর চেঙ্গান্নুরে একটি পথসভায় তিনি বক্তব্য রাখছিলেন, সেখানে কোনো চেয়ার, টেবিল, বা মঞ্চ ছিল না। রাস্তার ধারে মাইকের সমনে দাঁড়িয়ে তিনি জনসঙ্ঘের মতাদর্শ এবং উত্তর ভারতের সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারে জনসঙ্ঘের অসাধারণ প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, একদিন ভারতের মানুষের স্বাভাবিক পছন্দের তালিকায় জনসঙ্ঘ স্থান পেতে বাধ্য। তখন রাজনৈতিক দল হিসেবে জনসঙ্ঘ কেরলে একেবারে নতুন।

জনসঙ্ঘকে কেরলে স্থাপনের পেছনে পরমেশ্বরনজী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৬৭ সাল কোঝিকোড়ে জনসঙ্ঘের বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক জাতীয় অধিবেশন হয়েছিল। তখন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই সম্মেলন রাজ্যের মানুষের মধ্যে এক আগ্রহ সৃষ্টি করে। সংবাদমাধ্যমও এই অধিবেশনের প্রচার করে। ওই অধিবেশনের মূল স্থপতি ছিলেন পরমেশ্বরনজী। তাঁর ছিল অসাধারণ বাগ্মিতা, যা তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের কাছে ঈর্ষণীয় ছিল। যেখানেই তাঁর ভাষণ হতো, অনেক জনসমাগম হতো সেখানে।

আমি তখন উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র ছিলাম। আমি গেলাম এবং তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং আদর্শবাদের জন্য কাজ করে যেতে বললেন। পড়াশোনা শেষ করার পর যখন আমি ইউএনআই-তে সহ-সম্পাদকের কাজের প্রস্তাব পেলাম, তখন তাঁর আমন্ত্রণেই ১৯৭৯ সালে দিল্লিতে এলাম। তিনি আমাকে কিছুদিনের জন্য ডিআরআই-তে এবং তারপর ঝাণ্ডেলওয়ালায় কেশব কুঞ্জে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সঙ্ঘের তৎকালীন বৌদ্ধিক প্রমুখ বাপুরাও মোঘের আগ্রহে এবং পরমেশ্বরনজীর উপদেশক্রমে আমি 'জরুরি অবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংগ্রাম' বিষয়ে একটি বই রচনা করার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহের কাছে লিপ্ত হই। এই কাজটির পথপ্রদর্শক ছিলেন ঠেংড়ীজী। ১৯৮১ সালে পরমেশ্বরনজীর দিল্লি ছেড়ে চলে আসার আগে পর্যন্ত আমি কেশবকুঞ্জে তাঁর সঙ্গে থাকতাম। এই সময় আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সঙ্ঘ-প্রচারক। তিনি খুবই উদার মনের মানুষ ছিলেন কিন্তু আদর্শবাদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোশহীন। যুবকদের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অনেক। তিনি তাঁদের আদর্শবাদের শিক্ষা দিতেন।

পরমেশ্বরনজীর আগ্রহেই ১৯৮০ সালে আমি যখন আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি যাই, মায়ের জন্য মিষ্টি কিনে নিয়ে যেতে তিনি আমাকে ৫০ টাকা দিয়েছিলেন। অদ্ভুত এক স্নেহ এবং উদারতা ছিল তাঁর মধ্যে। প্রচারক হিসেবে টাকা খরচের ব্যাপারে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। তবুও মিষ্টি কেনার জন্য তিনি আমাকে ৫০ টাকা দিয়েছিলেন।

পরমেশ্বরনজীকে পদ্মশ্রী প্রদানের এক দৃশ্য।

স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তাঁর এরকম আবেগের সম্পর্ক ছিল।

তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমাদের সাপ্তাহিক মালয়ালম্ প্রকাশনা 'কেশরী'তে সাপ্তাহিক স্তম্ভ লেখা শুরু করি। কয়েকমাস পরে 'কেশরী' মানিঅর্ডারে আমাকে চারশো টাকা পাঠায়, সেই টাকা আমি গ্রহণ করি এবং পরমেশ্বরনজীকে পুরো ব্যাপারটা বলি। তিনি হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেশরী' থেকে সাম্মানিক নিতে পারবে? তুমি একজন প্রচারক।' উত্তর দেওয়ার কোনো ভাষা আমার ছিল না। নিজেকে অপরাধী মনে হলো এবং 'কেশরী'র সম্পাদক এস.এ. কৃষ্ণানকে আমাকে সাম্মানিক না পাঠানোর জন্য বললাম।

টাকা পয়সার ব্যাপারে পরমেশ্বরনজীর এরকম চিন্তা ভাবনা ছিল। প্রচারক হিসেবে সঙ্ঘের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা থেকে তিনি কোনোরূপ বিচ্যুতি পছন্দ করতেন না। মাঝে মধ্যে তিনি সঙ্ঘের কর্মপদ্ধতি, ব্যবহারিক দিক এবং আদর্শবাদ নিয়ে গভীর চিন্তন করতেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতাম। বিভিন্ন বিয়য়ের ওপর বিতর্ক তিনি খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু আমি যদি কোনো বিষয়বিন্দু নিয়ে জেদ করতাম, তাহলে তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন, যার অর্থ ছিল তিনি ওই বিষয়ে আর আলোচনা চালানোর পক্ষপাতী নন। এই রকম ক্ষেত্রে তিনি দু' একদিন ধরে কোনো কথাই বলতেন না। তারপর তিনি একটু হাসতেন এবং স্নেহ ও উৎসাহ দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিতেন। পরমেশ্বরনজী যখন দিল্লিতে থাকতেন, তখন কেশবকুঞ্জ কর্মোদ্দীপ্ত থাকত। বাপুরাওজী, ভাউরাউ দেওরস, দত্তোপন্তোজী, রজ্জুভাইয়াজী, অশোক সিংহলজী এবং আরও অনেক প্রবীণ প্রচারক সেখানে থাকতেন।

ডি. আর. আই. (দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) থেকে হয়ে তিনি কেরলের উদ্দেশে রওনা দিলেন 'ভারতীয় বিচর কেন্দ্র' তৈরির জন্য। পরবর্তীকালে তিনি কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ কেন্দ্রের প্রধান হয়েছিলেন। এই সময়কালে মার্কসবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তিনি মালায়ালম ভাষাতে অনেক বই লিখেছেন। বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা সংগ্রহ করে তিনি ভগবদ্গীতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ওপর দুটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সঙ্ঘের কেরল শাখা যে কয়েকজন বিরল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কার্যকর্তাকে তৈরি করেছিল, পরমেশ্বরনজী তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, লেখক এবং সুবক্তা, যাঁর মানসিক ঝোঁক ছিল আধ্যাত্মিকতার দিকে।

তিনি ছিলেন কেরলের ঘরে ঘরে পরিচিত মানুষ। তিনি সংগঠনের রাজ্য ও অখিল ভারতীয় স্তরে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক। দিল্লিতে তিনি আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে ছিলেন। এই তালিকায় ছিলেন--- স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, অটলবিহারী বাজপেয়ী, এল কে আদবানী, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, পি. রামমূর্তি প্রমুখ। তিনি যখন ডি আর আই-তে ছিলেন তখন বহু সভায়, কর্মশালায় এবং সেমিনারে চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আহ্বান করতেন। ডি আর আই-এর মাসিক বৌদ্ধিক পত্রিকা 'মন্থন'-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। মার্কস, গান্ধী, দীনদয়াল এবং নবজাগরণের অগ্রদূত নারায়ণগুরুর ওপর তিনি বই রচনা করেছেন। এছাড়াও ইংরেজি ও মালয়ালামে নিয়মিত স্তম্ভও লিখতেন।

পরমেশ্বরনজী ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা ও উদার চিন্তাধারার মানুষ। আশির দশকের প্রথম দিকে বিখ্যাত প্লেব্যাক গায়ক যিশুদাসকে গুরুভায়ুর মন্দিরে প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তিনি একবার বলেছিলেন, ধর্মীয় গুরুদের ভোটে লড়া এবং রাজনীতির যোগদান করার প্রবণতা ঠিক নয়। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ''যদি ধর্মীয় গুরুরা রাজনীতির স্রোতে গা ভাসাতে শুরু করেন, তাহলে ধর্মের রক্ষা করবে কে?''

কেরলে সিপিএম এবং আরএসএসের সংঘাত নিয়ে পরমেশ্বরনজী খুব ব্যথিত ছিলেন। বহুবার তিনি দু'পক্ষের মধ্য বিজেপির ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং সিপিএমের নেতা ই.কে. নায়ানার এবং ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে আশির দশকে বহুবছর দু' পক্ষের মধ্যে শান্তির পরিবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দিল্লির দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতাদর্শে তিনি ভারতীয় বিচার কেন্দ্র (বি.ভি.কে.) স্থাপন করেছিলেন। বি ভি কে সম্প্রতি অনেক বইপত্র প্রকাশ করেছে। নতুন নতুন ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শবাদকে স্থাপন করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিবিধ সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও ছিল তাঁর আগ্রহের বিষয়।তাঁর সংগঠন নিয়ে অন্যের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন। খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে তিনি অনবরত বার্তালাপ করতেন। তিনি ছিলেন একজন ভালো কবি। তাঁর বহু কবিতা আজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিত্যশাখায় গীত রূপে গাওয়া হয়।

সঙ্ঘের কেরল শাখা থেকে যতজন প্রচারক বেরিয়েছেন, পি. পরমেশ্বরনজীর মতো জাতীয় স্তরে এত স্বীকৃতি আর কেউ পাননি। বাজপেয়ী সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে এবং নরেন্দ্র মোদী সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছে। নব্বইয়ের দশকে তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করার প্রস্তাব দেয় বিজেপি, কিন্তু তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর পরিবর্তে ও. রাজাগোপালের নাম প্রস্তাব করেন। তাঁর জীবন ছিল আত্মত্যাগ এবং অঙ্গীকার পূরণের জীবন্ত উদাহরণ।

(লেখক সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার' পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাকরণ

জিষ্ণু বসু

ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে একমাত্র ব্যতিক্রম। আরব সম্রাজ্যবাদীরা বা ইউরোপের আক্রমণকারী ঔপনিবেশিকরা যেখানেই গেছে সেখানেই প্রাচীন সভ্যতার সব চিহ্ন শেষ হয়ে গেছে। প্রাচীন মিশর কত উন্নত ছিল। সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে। আরবদেশ থেকে মুসলমান আক্রমণকারীরা এসে মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে মিশরের সংস্কৃতি শেষ করে দিয়েছিল। ৬৩৯ সালে উমর-ইবন-অল-আস ৪০০০ আরব উপজাতি সেনা নিয়ে মিশর আক্রমণ করেছিল। ৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রাচীন মিশর ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। দু' একটা বাদ দিলে পিরামিডগুলো ফাঁকা করে দিয়েছিল আরব আক্রমণকারীরা। আজকের মিশরে তুতেন খামের বা রামেসাম নামের কোনো মিশরীয়কে কায়রোর রাস্তায় ঘুরতে দেখবেন না।

মায়া, আজটেক বা ইনকা সভ্যতাও অনেক প্রাচীন ছিল। মায়ারা পাঁচ হাজার বছরের ক্যালেন্ডার বানিয়েছিল, জ্যোতির্বিদ্যার বহু বিষয় তারা বুঝতে পারত, তাদের ভাষা ছিল, লিপি ছিল, সাহিত্য ছিল। খ্রিস্টফর কলম্বাস ১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। এরপর শুরু হলো অমানবিক অত্যাচার। লড়াই করেছিল রেড ইন্ডিয়ানরা। কিন্তু নির্বিচারে গুলি করে হত্যা, গণধর্ষণ আর ধর্মান্তরণের ফলে মাত্র ১০০ বছরের মধ্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল ইনকা, মায়া, আজটেক সভ্যতা। আজ সৃষ্টির দেবতা সূর্যদেব পাচাকামাকের নিত্য পূজা হয় এমন কোনো মন্দির উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও নেই। স্পেনের আক্রমণকারীরা ১৩০০ বছরের পুরাতন পেরুর সূর্যমন্দির ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু আজ পেরুতে বা দক্ষিণ আমেরিকার বা সমগ্র দুই মহদেশে এমন মানুষ আর অবশিষ্ট নেই যে তারা তাদের উত্তরাধিকার দাবি করবে। ইউরোপের খ্রিস্টান আক্রমণকারীর দল আমেরিকার সভ্যতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে।

ভারতবর্ষেও আক্রমণ কম হয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে আরব ও ইউরোপ দুই উপনিবেশ এখানে কায়েম ছিল। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার সহ্য করবার পরেও আজও ভারতবর্ষ টিকে আছে। ভারতবর্ষের এই অসাধারণ বিজয়ের পিছনে আছেন বহু যুগাবতার পুরুষ। যাঁরা যুগে যুগে সমাজকে সঠিক পথ দেখিয়ে এই অসাধ্যসাধন করেছেন।

যদি জগদ্‌গুরু আদি শঙ্করাচার্য না আবির্ভূত হতেন তাহলে ভারতবর্ষের কী অবস্থা হতো! বৌদ্ধধর্ম যেদিন তার দর্শনের ধার হরিয়েছে। কেবল আচার সর্বস্বতা আর বিকৃত তন্ত্র ধর্মটার আসল শক্তিটাই নস্ট করে দিয়েছিল। তাই কেবল বৌদ্ধ শক্তি দিয়ে সেদিন ভারতবর্ষ আরব সাম্রাজ্যবাদী ইসলামকে রুখতে পারত না। শঙ্করের প্রভাব কয়েকশো বছর ভরতবর্ষকে বাঁচিয়েছিল।

তারপর যখন প্রায় সমগ্র দেশটাই ইসলামের কবলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন যে সমস্ত মহাপুরুষ এসেছিলেন তাদের মধ্যে গুরুনানকদেব (১৪৬৯–১৪৩৯) এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬–১৫৩৪) নাম আসে সবার আগে। একজন পশ্চিম ভারতকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যজন পূর্বভারতকে।

বঙ্গদেশের বীরেরা বহুদিন পর্যন্ত আরবদের আক্রমণ থেকে নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছিলেন। বঙ্গের শস্যশ্যামলা ভূমি, শিল্পকার্য, ধাতুশাস্ত্রে নৈপুণ্য বা ধনসম্পদের কথা বহুদিন থেকেই বিদেশি আক্রমণকারীদের জানা ছিল। বাঙ্গলা, গুজরাত আর কেরলের বণিকেরাই মূলত আরবদের সঙ্গে বাণিজ্য করত। তাই বাঙ্গলার সমৃদ্ধি তারা হাতের তালুর মতোই চিনতো। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ-

বিন-কাশেমের সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলমান আগ্রাসন শুরু হলো। ১০২৫ সালে গজনির সুলতান মামুদ গুজরাতে সোমনাথ মন্দির লুঠ করল। তখন বাঙ্গলা শাসন করছেন মহীপাল। তারও অনেক পরে ১২৫৪ সালে এক ইয়েমেন থেকে আসা সুফি ভেকধারী শাহ জালালের প্রতারণাতে হেরে গেলেন শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দ।

মহারাজ গৌরগোবিন্দের পরাজয়ের পর শ্রীহট্ট শ্রীহীন হতে থাকে। যে শ্রীহট্ট সংস্কৃত শিক্ষায়, ন্যায় শিক্ষায় সারা ভারতবর্ষে অগ্রগণ্য ছিল, সেখান থেকে পণ্ডিতেরা অত্যাচর সহ্য না করতে পেরে পালিয়ে আসতে শুরু করেন। বাঙ্গলার হিন্দু রাজত্ব রক্ষার চেষ্টা যশোরের প্রতাপাদিত্যও করেছিলেন। কিন্তু ১৬১১ সালের জানুয়ারি মাসে মুঘল সেনা মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নৌবহর আক্রমণ করল। রাজা প্রতাপাদিত্যের পরে আর বাঙ্গলাতে কোনো আশা থাকল না।

ভারতের আকাশে এমনই ভয়ানক সঙ্কটময় সময়েই পূর্বভারতের পরিত্রাতা হয়ে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। মহাপ্রভূর পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম থেকে আসেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপ তখন নব্যন্যায়ের নতুন তীর্থক্ষেত্র। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলার মহাপণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের কাছ থেকে নব্যন্যায় শিক্ষা লাভ করে নবদ্বীপে তার চর্চা শুরু করেন। তাঁরই শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণিকে প্রাচ্যের সক্রেটিস বলা হয়। রঘুনাথও সম্ভবত শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড থেকে নবদ্বীপে পড়তে এসেছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাইও মহাপণ্ডিত হলেন। তবে ন্যায় বা নব্যন্যায়ে নয়, হলেন ব্যাকরণে। ব্যাকরণ মূলত যুক্তিনিষ্ঠ, খানিকটা বিজ্ঞান অনুসারী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এক অভিজ্ঞ বৈয়াকরণিকের ছাপ সুস্পষ্ট।

গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের পরে নিমাই পণ্ডিতের মনের আমূল পরিবর্তন হলো। মহাপণ্ডিত, অসীম সাহসী, তার্কিক, পরম গৃহস্থ একজন সফল সম্পন্ন মানুষ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত নিলেন। সেই সময় সমাজকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন ছিল ত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের। এবিষয়ে পরবর্তী জীবনে ছোটো হরিদাসের প্রতি গৌরাঙ্গের কঠোরতা সেই রেজিমেন্টালাইজেশন এই কঠোরতার শিক্ষাই দেয়। ছোটো হরিদাস ভিক্ষা করতে গিয়ে গৃহস্থ মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলেন মাত্র। মহাপ্রভু তাকে ভর্ৎসনা করেন। হরিদাস মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করেন। মহাপ্রভু তাঁর শেষদর্শনও করেননি। এই সুশৃঙ্খল সন্ন্যাসী বাহিনী সমাজ আর রাষ্ট্র রক্ষা করবে। নিজের জীবনেও তিনি মা শচীকে দুপুরের খাবার দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সন্ন্যাস আশ্রমে কখনো দেখা করেননি। এই রেজিমেন্টালাইজেশন বঙ্গদেশে তাঁরই আবিষ্কার।

দ্বিতীয় আবিষ্কার নগর সংকীর্ত্তন আর হরিনাম প্রচারযজ্ঞ। সেটি আসলে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। যে জাতি পরাধীন, বীর সাহসী ক্ষাত্রতেজের যেখানে অভাব সেখানে এই শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মে উন্নত একটি জাতিকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় ছিল না। একসঙ্গে এতজন মানুষ এক হয়ে সঙ্ঘবদ্ধতা অনুভব করত। মনে জোর আসত যে এই হিন্দুদের আঁচড়ানো, কামড়ানো, ছিঁড়ে ফেলা সহজ হবে না। নবদ্বীপে যখন অদ্বৈত আচর্যের ঘরে প্রবেশ করে মৌলানা সিরাজুদ্দিন ওরফে হাবিবুর রহমান ওরফে চাঁদকাজি সংকীর্তন বন্ধের নিদান দিয়েছিলেন, তার প্রতিক্রিয়ার কাজির তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ধরা পরেছিল যে হিন্দুদের এই একত্রিত শক্তি প্রদর্শন আসলে নবজাগরণ। মহাপ্রভু সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। চারদিক থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে মশালের আলোতে এগিয়ে চলল নগর সংকীর্তন। গন্তব্যস্থল চাঁদকাজির প্রাসাদ। ভীতসন্ত্রস্ত কাজি আত্মসমর্পণ করলেন। সেদিন মহাপ্রভু নগর সংকীর্তন করার 'পাশা' অর্থাৎ অনুমতি ফলক নিয়ে ফিরেছিলেন। এই জয় বাঙ্গলার হিন্দুদের বেঁচে থকার ছাড় পত্র হয়েছিল। আজও পশ্চিমবঙ্গে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আর পাকিস্তানের ভয়াবহ সন্ত্রাসের পরেও পূর্ববঙ্গে ৮ শতাংশ হিন্দু নামধারীর অস্তিত্ব তার ছাড়পত্র নিয়ে সেদিন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ফিরেছিলেন।

তাঁর তৃতীয় আবিষ্কার নীলাচলে। বাঙ্গলা ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। ওড়িশা তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত। গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র তখন তিন দিকে তিন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব বাঙ্গলার হুসেন শাহের সেনাপতিকে মারতে মারতে হুগলীর মন্দারণ দুর্গ পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। লড়াই করছেন গোলকুণ্ডার কুতুবশাহির সঙ্গে। একইসঙ্গে তাঁর ভয়ানক প্রতিপক্ষ ছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্য। এই ত্রিমুখী লড়াই লড়ে গজপতি সাম্রাজ্যের অমিত বিক্রমশালী সামরিক শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েগিয়েছিল।

এই জিঘাংসার কোনো একমুখী লক্ষ্যও ছিল না। হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দুর লড়াই যে ওই ভয়ানক সময়ে কতটা মূর্খতা সেটা বুঝেছিলেন মহাপ্রভু। গজপতি রাজ পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চি জয় করে কাঞ্চির আরাধ্য দেবতা 'গণেশ'কে নিয়ে এসেছিলেন। আজও পুরীর মন্দির পরিসরে শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে সাক্ষীগোপাল মন্দিরের পাশেই অবস্থান করছেন সেই কাঞ্চি গণেশ বা ভণ্ড গণেশ বা উচ্ছিষ্ট গণেশ। এই ধরনের সংস্কৃতি হিন্দু রীতি বিরোধী। হিন্দুদের যে শাশ্বত পরম্পরাতে এসবে গভীর আঘাত লাগছিল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র অনেক সংহত করলেন নিজের শক্তিকে।

এরপর থেকে ওড়িশা পূর্বভারতের পরম আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল। উত্তর ভারত থেকে, পূর্ব ভারত থেকে মানুষ এসে আরয় গ্রহণ করল, ওড়িশার এক একটি অনুন্নত, জঙ্গলের দায়িত্ব নিতে এসেছিল হিন্দু রাজন্যবর্গ। ওড়িশার এই উত্তরণের শুরুটা হয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে। তাই বাংলা এবং উড়িষ্যার মধ্যেকার সম্পর্ক যেমন মহাপ্রভু স্থাপন করেছিলেন, তেমনই ওড়িশাকেও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।

যদিও ভক্তি আন্দোলনের শুরুটা দক্ষিণ ভারতে তবু পূর্বভারত আর উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এই বিজয়ী আন্দোলনের প্রচার প্রসারে মহাপ্রভূর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুর চতুর্থ আবিষ্কার হলো 'বৃন্দাবন'। ভগবান কৃষ্ণের বাল্যলীলা, ভক্তিরসের প্রেমধারার মূলভূমি তো বৃন্দাবন। বৈষ্ণব রসসাহিত্য যে বৃন্দাবনের উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী কয়েকশো বছর এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ভিত হয়ে উঠেছিল তার জন্য বৃন্দাবন আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ লীলাক্ষেত্র খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলেন উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার ওই জঙ্গলে। এরপর থেকে সেইস্থান ধীরে ধীরে এক ধর্মনগরী গড়ে উঠল। ষড় গোস্বামীর আবির্ভাবে তা পূর্ণ হয়েছিল। সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও জীব গোস্বামী এই শক্তপোক্ত দার্শনিক, সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিলেন যা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছিল। নরসিংহ মেহতার বিখ্যাত গান, 'বৈষ্ণব জন তো তেন কহিয়ে /

যে পীড় পরায়ী জানে রে' মানে যিনি অপরকে ভালোবাসতে জানে তাকে বৈষ্ণব বলে। এই কালজয়ী ভাবনা বিদেশি আক্রমণের শেষভাগে ভারতবর্ষকে বাঁচিয়েছে। তার কেন্দ্রে ছিল বৃন্দাবন। যা আধুনিক যুগে আবিষ্কার করলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

মহাপ্রভুর পঞ্চমতম আবিষ্কার অবশ্যই আচণ্ডালে হরিনাম বিলিয়ে দেওয়া। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের কর্কটরোগ। ওই একটি দোষ সর্বগুণ, সর্বশক্তি সম্পন্ন হিন্দুজাতিকে বিলুপ্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। মধ্যযুগে হিন্দুসমাজ বিলুপ্ত হয়ে যেত যদি শ্রীচৈতন্যের মতো মহাপুরুষ না আবির্ভূত হতেন। হরিনাম জপ করলে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল সকলে উদ্ধার হবে এটা যুগান্তকারী সুত্র ছিল। আজও পশ্চিমবঙ্গে যে জাতিভেদের কুৎসিত চেহারা অনেকটা কম দেখা যায় তার মূল কারণ ওই নিমাই পণ্ডিত। শিক্ষাষ্টকমের তৃতীয় স্তোত্রে চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—

'তৃণাদপি সুনীচেন ব তরোবহপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি।।'

এই 'অমানিনা মানদেন' সমাজকে এক রেখেছে। এই অদৃশ্য শক্তি বঙ্গদেশকে আফগানিস্তান হতে দেয়নি। যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, ক্ষণজন্ম পুরুষ যাঁরা তাঁদের ভাবনাকে কেবল সমকালের বিচারে ভাবলে ভুল হবে। আবহমানকালের প্রেক্ষাপটে ভাবা প্রয়োজন। বাঙ্গলার মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে আধুনিক কালের শিল্প সাহিত্য পর্যন্ত যুক্তিবাদী বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন মানবদরদি শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বিদ্যমান। বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল লিখেছেন ১৪৮৪ সালে। সেই 'পদ্মাপুরাণে' দেবী মনসা চাঁদ সদাগরের পুত্রদের মৃত্যুতে জয়ের হাসি হাসছেন। কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ সাল নাগাদ 'মনসা বিজয়' লেখেন। তাঁর জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়াতে। সেদিনও মহাপ্রভুর ভাবনা সারা বঙ্গদেশে ছড়িয়ে যায়নি। কিন্তু চৈতনোত্তর যুগে যাঁরা 'মনসামঙ্গল' লিখলেন সেখানে দেবী মনসার এক অপরূপা দয়াময়ীভাবের প্রকাশ দেখা গেল। সপ্তদশ শতকের কবি কেতক দাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের দেবী মনসা কেঁদে ফেললেন চাঁদের পুত্রদের মৃত্যুতে। এ এক সাংস্কৃতিক উত্তরণ। এই মানবিক শক্তি একটি সমাজকে কালজয়ী জাতিতে পরিণত করে। বাঙ্গলার শক্তিশালী সাহিত্য যা পরবর্তীকালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে সমগ্র ভারতবর্ষকে মুক্তি প্রদানের অন্যতম সহায়ক হয়েছিল সেই বাংলাসাহিত্য সংস্কৃতিকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে পরিণত করাটা ছিল চৈতন্যদেবের অপর এক আবিষ্কার। তা কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' বা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'চৈতন্যভাগবত'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আধুনিক সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চুয়াচন্দন' পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে।

এইসব আবিষ্কার আর তার প্রয়োগের মধ্যে এক বিজ্ঞানমনস্কতার আগে আছে এক বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সেইসঙ্গে এক বৈয়াকরণিকের যুক্তিবোধ। আরব সাম্রাজ্যবাদ ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার পরেও ভারতবর্ষ বেঁচে আছে। আরব সাম্রাজ্যবাদের প্রবেশস্থল সিন্ধুপ্রদেশ ভারতীয় সংস্কৃতির এককালের কেন্দ্রস্থল ছিল। আজ তা একটি মৌলবাদী ইসলামি দেশের অংশ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবেশস্থল ছিল বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু আজও ভারতীয় সংস্কৃতিকে বহন করছে। বাংলাদেশে এত মৌলবাদী অত্যাচারের পরেও 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, বলো হরেকৃষ্ণ হরে রাম' সংকীর্তন বন্ধ হয়নি। ১৯৭০ সালে খানসেনারা ফরিদপুরের জগদ্‌বন্ধু মঠের শ্রীরঙ্গম আশ্রমের মাঠে ১১জন সংকীর্তনরত সন্ন্যাসীকে একসঙ্গে গুলি করে হত্যা করেছিল। কিন্তু আজও হরিনাম সেখানে বন্ধ হয়নি। ২০২০ সালের গৌরপূর্ণিমার দিনও কেউ ফরিদপুরে গেলে দেখতে পাবেন হরিনামে নেচে গেয়ে মাতোয়ারা ভক্তের দল।

প্রাণের গৌর যে আমাদের সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে গেছেন, নিমাই পণ্ডিতের ব্যাকরণ ভুল হবার নয়। এই বঙ্গভূমিকে শেষ করবে এমন ক্ষমতা কারো নেই।

■

আদর্শ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

সমীর চট্টোপাধ্যায়

কাটোয়া ছাড়া বঙ্গদেশের অন্যান্য বৈষ্ণবমন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ দু'হাত ঊর্ধ্বে তুলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্যরত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর চব্বিশোর্ধ্ব বয়ঃক্রম থেকেই তিনি দশনাম সম্প্রদায়ের একজন আদর্শ সন্ন্যাসী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বকালের সকল সন্ন্যাসীর আদর্শস্বরূপ। তিনি আদি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ভারতী সম্প্রদায় থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও ওই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে তিনি কোনো যোগাযোগ রাখতেন না। কিন্তু তাঁর গয়াধামে অবস্থানকালে দশনামি সম্প্রদায়ের পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শ্রীমন্ ঈশ্বরপুরীর কাছ হতে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তিনি যথাবিধি আত্মশ্রাদ্ধ শিখামুণ্ডন উপবীত বর্জন করে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করে সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে সন্ন্যাসী সঙ্ঘের আদর্শ সন্ন্যাসীর ন্যায় চিরকাল অতিবাহিত করে গেছেন। সে কারণে গৌরভক্তগণ তাঁকে ন্যাসী চূড়ামণি অভিহিত করতেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজ মুখেই বলেছেন—

এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার
অতএব অবশ্য
আমি সন্ন্যাস করিব।
(চৈতন্যচরিতামৃত)

তখন তিনি ছিলেন নবদ্বীপে। তারপর এলেন কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে কেশব ভারতীর আশ্রমে। এরূপ বর্ণিত আছে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে—

এত বলি ভারতী গোঁসাই কাটোয়াতে গেলা
মহাপ্রভু তাহা যাহা সন্ন্যাস করিলা
চব্বিশ বছর শেষে যেই মাঘ মাস
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।

তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের বিবরণ শুনলে ভক্তহৃদয়ে আজও করুণ রসের সৃষ্টি হয়। সেদিন গভীর রাত্রে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হলো।

প্রসন্ন চিত্ত সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসীগণ বৃত্তাকারে উপবিষ্ট হলেন। মুণ্ডিত মস্তক, শিখাসূত্রধারী, শুচিশুভ্র বেশ পরিহিত তেজপুঞ্জকায় শ্রী বিশ্বম্ভর মিশ্র অগ্নি সম্মুখে স্থিরাসনে শোভিত হচ্ছেন। তাঁর পার্শ্বে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ যোগীরাজ ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ ভারতী সুখাসনে সমাসীন। ব্যাস-বশিষ্ট-শুক-শঙ্করের ভারতে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য যেন আবার আত্মবিদ মহর্ষিগণের আবির্ভাব ঘটেছে। ভারতের প্রাণগঙ্গার গৈরিক স্রোতে পুনরায় উত্তাল তরঙ্গের তুফান উঠেছে। পল্লী বাঙ্গলার শ্যামল তটভূমিতে এসে সে উদ্বেল তরঙ্গ প্রবাহ বুঝি পরিণতির পথে চলেছে—বুঝি আরও একবার রূপ পরিগ্রহ করতে চাইছে নিথর নিঝুম হিমের নিশীথে অশোক-বকুল-বট-অশ্বত্থের ছায়ায় ঘেরা ভারতী মহারাজের আশ্রমে। যেন আজ নগাধীশ হিমালয়ের গাম্ভীর্যময় প্রশান্তি নেমে এসেছে। ভারতী মহারাজের নির্দেশানুসারে শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়া সুসম্পন্ন হলে বিরজাহোম আরম্ভ হল। নিমাই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়ে আত্মশুদ্ধি করলেন—বর্ণ, আশ্রম, দেহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ইহলোক-পরলোকের ভোগবাসনা, সংসারপাশ, জীবাভিমান সমস্ত অজ্ঞান চিরতরে ভস্মীভূত হলো। ভারতী মহারাজ শিখা ছেদন করে দিলেন। যজ্ঞসূত্র ও শিখা ভস্মে পরিণত হলো। মায়িক জগতের সঙ্গে, গৃহ-গৃহাস্থাশ্রমের সঙ্গে নিমাইয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলো। শিখাসূত্র বিহীন সন্ন্যাসী জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় দীপ্যমান হলেন। তাঁর স্থির ধীর প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি দেখে সকলের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হলো। আচার্য ভারতী মহারাজ তাঁকে শেষ মন্ত্র পরমহংস গায়ত্রী ব্রহ্মমন্ত্র, মহাবাক্যাদি শ্রবণ করালেন এবং গৈরিক রঞ্জিত কৌপীন, বহির্বাস, দণ্ড, কমণ্ডলু দান করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে তাঁকে বিভূষিত করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র সন্ন্যাসজীবন আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী চূড়ামণি। ত্যাগে, বৈরাগ্যে, নিরভিমানিতায়, লোকশিক্ষায়, সামাজিক প্রথা পালনে, শিষ্য শিক্ষণে তিনি ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, তিনি নারকেল খোলা দিয়ে তৈরি জলপাত্র ব্যবহার করতেন, তাঁর দেহের আকৃতির সমান ছোট ঘরে নীলাচলে গম্ভীরায় দীর্ঘকাল বাস করেছেন। দেহের প্রতি তাঁর ছিল না কোনো দৃষ্টি। সম্পূর্ণভাবে তিনি বিসর্জন করেছিলেন দেহের আরাম ও ভোগবিলাস। নীলাচলে অবস্থানকালে প্রতি বছর তাঁকে দেওয়া হতো শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী মূল্যবান কাপড় নন্দ উৎসবের দিন, তা তিনি মাথায় ঠেকিয়ে নিতেন কিন্তু ব্যবহার করতেন না, পাঠিয়ে দিতেন জননী শচীমাতার কাছে পরমানন্দ পুরীর অভিপ্রায় অনুযায়ী। বাল্যসখা ও চিরসঙ্গী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জগদানন্দ মিহি গেরুয়া কাপড়ে ভালো শিমূল তুলো দিয়ে তৈরি করানো বালিশ ও গদি যা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নবদ্বীপ থেকে—তা তিনি গ্রহণ করেননি। গম্ভীরার মেঝেতে সরলার (কলাগাছের থোড় হতে প্রস্তুত তখনকার দিনে প্রচলিত একপ্রকার মাদুর) বিছানায় শুয়ে রাত্রিযাপন করতেন। সারা জীবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন। সারাজীবন তিনি মাধুকরী করে জীবনধারণ করেছিলেন। শুধুমাত্র জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করতেন। তার একান্ত প্রিয় ছোট হরিদাসকে চিরকালের মতো পরিত্যাগ করেছিলেন ভালো চাল সংগ্রহ করার অপরাধে। ■

সব মেকিরা এক হয়েছে হিন্দুদের ঠেকাতে

হিন্দুরা আজ জেগেছে ভাই হিন্দুস্থানেতে,
ভেদ-ভাবনা ভুলে গিয়ে এক হলো রাম নামেতে।।
হিন্দু রক্ত মাছের রক্ত গরম হওয়া বড়োই শক্ত,
একবার গরম হলে পরে কেউ পারে না রুখিতে।।
৬ ডিসেম্বরের ঝড়ে বাবরি-ধাঁচা ভেঙে পড়ে
হিন্দুরা না জাগালে পরে ধাঁচা ভাঙল কেমনে?
গোধরা কাণ্ড ঘটল বলে গুজরাটে আগুন জ্বলে,
করসেবকদের হত্যার বদলা গুজরাটবাসী নিয়েছে।।
সুপ্রিম কোর্ট দিল রায় মন্দির হবে অযোধ্যায়,
ভব্য-মন্দির হবেই এবার রামজন্মভূমিতে।।
তাই দেখে ভাই ভয়ে ভীত ডান-বামেরা আছে যত,
সব মেকিরা এক হয়েছে হিন্দুদেরে ঠেকাতে।।

—গুরুপদ চন্দ,
দীঘা, ঘোষপাড়া, নদীয়া।

দিনের বেলাতেই ভূতের ভয়

একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় দেখতে পেলাম ভারত সীমান্তে বাংলাদেশ সরকার নিরাপত্তা জোরদার করেছে। এ ব্যাপারে বিজিবিকে সতর্ক করেছে অর্থাৎ বাংলাদেশ নিরাপত্তা রক্ষী বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে। উদ্দেশ্যটা আগে থেকে পরিমাপ করছিল বাংলাদেশ সরকার। এটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। সিএএ এবং এনআরসি আতঙ্কে প্রতিদিন ঢুকছিল প্রচুর বাংলাদেশি। ওরা যতই চেঁচাক না কেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো। সেটা যেন ভাঁড়ে মা ভবানী। সত্যিই যদি এত ভালো হয় তবে এত বাংলাদেশি ভারতে ঢুকলো কী করতে? এটা শুধু অবাঞ্ছিত বাংলাদেশিদেরকে ঠেকানোর প্রয়াস মাত্র। এই দুই কোটি বাংলাদেশিদের জায়গা এবং খাবার মেটানোর দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুতেই মেনে নেবে না। ওরা এটাই প্রমাণ করবে মোদী সরকার ভারত থেকে অহিন্দু বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি ধুয়া তুলে খেদিয়ে দিচ্ছে। কারণ চেহারা তো আর প্রমাণ করবে না কে ভারতীয় আর কে বাংলাদেশি। উভয় দেশের মানুষের আচরণগত পার্থক্য খুঁজে বের করা ভগবানেরও অসাধ্য। এতে বিদেশের কাছেও ঢাক পেটাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ওরা চেষ্টা চালাবে মোদী সরকার মুসলমান বিরোধী প্রমাণ করতে। তাতে ও দেশের জনগণকে খেপিয়ে তোলার একটা অকাট্য যুক্তি খাড়া করবে। আর এভাবেই ওরা শুরু করবে সীমান্তে গোলমাল বাধাতে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা ১১৫ জন ধীরবকে আটক করেছে। তারা নাকি ওপার বাংলার সীমান্তে ঢুকে পড়েছে। ও দেশের লেফটেন্যান্ট ইমতিয়াজ আহমেদ বলেছেন ওরা নাকি শুধু ওদের জল সীমানায়ই প্রবেশ করেনি, ওরা সেখানে প্রচুর মাছও ধরেছে। ওদের বক্তব্য, ওরা কোস্টগার্ডের মাধ্যমে এমন নজরদারি চালাতেই থাকবে। এই ঘটনা শরৎচন্দ্রের একটি গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়, পার্বতীর মাস্টারমশাইয়ের যেদিন মন ভালো থাকতো না, সেদিন পুরোনো পড়া জিজ্ঞেস করে না পারার অজুহাতে বেতের ব্যবস্থা করতেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই চলছে না। ভারত সরকার কিন্তু এখনো এনআরসি আইনটি লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ করেনি। শুধু পাশ হয়েছে সিএএ, এতেই দেশে ও বিদেশে বেশিরভাগ নেতা নেত্রী তেড়ে ফুড়ে উঠেছে। সবাই গন্ধ পাচ্ছে ভারত শক্তিশালী হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। এটা যদি কোনো নেতা বা নেত্রী ভেবেই থাকে তাতে তো আমি দোষের কিছু দেখেছি না। এটা যেন দিনের বেলাতেই ভূতের ভয়।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

যন্ত্রণায় ঘৃতাহুতি কেন?

গত ১০ ফেব্রুয়ারি 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বর্ণাশ্রমের অপব্যাখ্যায় সংরক্ষণ' শিরোনামের লেখাটি পড়লাম। তৃতীয় প্যারার শেষাংশের বক্তব্যটি কি সংবিধান অবমাননা নয়? এটা কি সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরকে অপমান করা নয়? বর্তমান ভারতবর্ষে ক্ষমতা কি নিম্নবর্গের মানুষের কুক্ষিগত? শতকরা হিসাবে আজ যতজন নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চ শিক্ষিত হয়েছেন বা চাকুরিতে নিয়োজিত হয়েছেন সেটা কেবলমাত্র সংরক্ষণের ফলেই হয়েছে— সেটা কি অস্বীকার করার উপায় আছে? প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব উচ্চ বর্ণের হাতে— সেটা কি অস্বীকার করতে পারেন? আর তারাই সংরক্ষণ আইন বাঁচাতে বাধ্য হয়ে নিম্নবর্ণের কাউকে পদে বসান নতুবা আজকের ভারতবর্ষে নিম্ন বর্ণের কোনো মানুষের পক্ষে রাজনৈতিক পদে বসা অসম্ভব হতো। আর নিম্নবর্ণের সেই লোকটি যদি তাদের ইয়েস ম্যান না হন তবে চক্রান্ত করে তাকে অপদস্থ করে প্রমাণ করা হয় যে, নিম্নবর্ণের লোক ক্ষমতা পাওয়ার উপযুক্ত নন। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত শুধুমাত্র নিম্নবর্ণের হওয়ার জন্য এ সমাজের নারীকে ধর্ষণ, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে খুন, আগুন জ্বালিয়ে গৃহহীন করা সম্পর্কে কী বলবেন? ক'জন উচ্চবর্ণের পুরুষ জেনে শুনে নিম্নবর্ণের মেয়েকে সামাজিক ভাবে বিয়ে করেছেন? ড. আম্বেদকরের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট কেন প্রকাশ করা হলো না? আমরা এমন দেশে আছি যে দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পর্যায়ের ব্যক্তি নিম্নবর্ণের মানুষদের রাস্তার কুকুরের সঙ্গে তুলনা করতে দ্বিধা বোধ করেন না। আমরা অত্যন্ত যন্ত্রণায় জীবন কাটাচ্ছি— দয়া করে আমাদের এই যন্ত্রণায় আর ঘৃতাহুতি দিবেন না। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০-তে ঘোষিত Prathvi Raj Chanhan Vs. Union of India মোকদ্দমায় মহামান্য শীর্ষ আদালতের রায় পড়ে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

—নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর,
বিবেকানন্দ রোড, শিলচর, অসম।

বাংলাদেশে মন্দির ভাঙচুর

বাংলাদেশের নীলফমারী জেলার অন্তর্গত সৈয়দপুর দক্ষিণ সোনাপলি এলাকায় একটি কালী মন্দিরের প্রতিমা ভেঙেছে জেহাদি

সন্ত্রাসীরা গত ১১.০২.২০২০-তে রাত ১২টা থেকে সকাল ৫টার মধ্যে। এই ব্যাপারে জীবনচন্দ্র রায় বাদী হয়ে সৈয়দপুর থানায় মামলা করেছেন। মামলা নং ০৯ তারিখ ১২.০২.২০২০ ধারা : ৫৪৭/ ২৯৫/৩৪ পেনাল কোড। বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচ খবর পেয়ে সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মো: আবুল হাসনাতের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি BDMW-এর সভাপতি রবীন্দ্র ঘোষকে বলেন ঘটনাটি খুবই বেদনাদায়ক। পুলিশ এহেন কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। সেই সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অশোক কুমার পালকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি BDMW-কে অবহিত করেন যে ভূমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিরোধের কারণে কিছু মুসলমান লোকর সংশ্লিষ্টতা খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি আরও জানান পুরানো স্মৃতি ধ্বংস করার প্রয়াস এবং হিন্দুদের ভীতি প্রদর্শনের জন্যও এ কাজ হতে পারে। তদন্ত অব্যাহত আছে। মামলার বাদী জীবন চন্দ্র রায়ের ছেলে সুমন চন্দ্র রায়ের সঙ্গে BDMW-এর সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানাচ্ছেন রাতে কে বা কারা এই ধর্মীয় অবমাননা করেছে তা তারা বুঝতে পারেননি। এই মন্দিরটির ৮ একর সম্পত্তি দেবোত্তর। কিছুলোক এই সম্পত্তি গ্রাস করার লোভে অনেকদিন ধরে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। BDMW-সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা এবং ভাঙচুরের নিন্দা করেছেন এবং অনতিবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। (BDMW-এর পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে)

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার,
চন্দননগর।

মেকি বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে সেকুলারি দেখান

মিডিয়ার কল্যাণে সিএএ ও শাহিনবাগের বিক্ষোভ-আন্দোলন রোজের খবর। কথা হলো, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে কাদের ক্ষতি আর কেনই বা তার বিরোধিতা? আচ্ছা বিশ্বের কোন দেশ বে-আইনি অনুপ্রবেশকে সাদরে স্বাগত জানাবে? কোন দেশে ধর্ম ও ভাষায় সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে অত্যাচার আর নিরাপত্তার অভাবে নিজ দেশ ত্যাগে বাধ্য হয় আর প্রতিবেশী কোন দেশে সাংস্কৃতিকগত মিল থাকলে সেই দেশেই আশ্রয় নেয়।

এভাবেই পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান হতে বিতাড়িত আশ্রয়চ্যুত অসহায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পারসিক, জৈন) ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, ভারত আত্মীয়তার বন্ধনে ও মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় ও সুরক্ষা দিয়াছে। এদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ (সিপিএম, কংগ্রেস, ডিএমকে ও পরবর্তীকালে টিএমসি) তা সমর্থন ও প্রচার করেছে তার রাজনৈতিক বা মানবিক যাই কারণ হোক না কেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেই আশ্রয়চ্যুত শরণার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করতেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করছে।

শরণার্থীদের স্বার্থ রক্ষার যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের আইনের পরিপূরক এবং যাদের স্বার্থের কথা এদেশের কম-বেশি সব রাজনৈতিক দল ও মিডিয়া সমর্থন করেছিল। তাহলে আজ কেন তারা উলটো পথে হাঁটছে। তাদের একটাই কথা, ধর্মের বিষয় কেন থাকবে। সংবিধানে সকলের সমান অধিকার, সংবিধানিক সমান অধিকার সব দেশবাসী (ভারতীয়রা) এটা চরম সত্য, তাই সকলেই মানতে বাধ্য। কিন্তু সে অধিকার বিদেশি নাগরিকদের জন্য নয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বর্মা, মায়নমারের সব নাগরিককে সেই সুবিধা ভারত দেবে কেন? যারা দাবি করছে তারা চীন বা পাকিস্তানে এই ধরনের দাবি করতে পারবে? এটা যে হাস্যকর নিজেরাও জানে। বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের থেকে অসহায় শরণার্থীদের পৃথকীকরণ ও আশ্রয় দিতেই এই ধর্ম কথাটির অবস্থান।

এদেশে বসবাসকারী নাগরিক (ভারতীয়)-দের ক্ষেত্রে এই আইন হয়নি এবং তা হতে পারে না। কারণ তা অসম্ভব ও অবাস্তব। যে কোনও দেশেই ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার ও দায়িত্ব আছে। এদেশেও তার অন্যথা হয়নি, হচ্ছে না ও কখনই হবে না। এই আইন বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য প্রযোজ্য এটা কী মিডিয়া বা রাজনৈতিক দলগুলি বোঝে না? তাহলে এই তামাশা কেন? কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও তাঁদের বশংবদ বামপন্থী এই আন্দোলনে ইন্ধন দিচ্ছে। আওয়াজ তুলেছে, 'ধর্মের নামে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চলবে না। আমরা সকলে মিলেমিশে থাকবো, ধর্মভেদ আমাদের আলাদা করতে পারবে না।' তাদের স্মরণ করাতে চাই, আমরা এদেশে কয়েক পুরুষ ধরে মিলেমিশে একসঙ্গেই আছি, থাকবো, আর এজন্য আপনাদের মতো কিছু বুদ্ধিজীবীর কোনো ভূমিকা নেই। আপনারা যদি এতই উদার, তাহলে আপনারা বা আপনাদের পূর্বপুরুষরা কেন পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এদেশে পালিয়ে এলেন? এখনও বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করছে। তাছাড়া বাংলাদেশ অবাসযোগ্য নয়, বরঞ্চ, উর্বরতা, অবস্থান, প্রাকৃতিকগত ভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উন্নত। তবুও থাকতে পারলেন না কেন?

একটি প্রচলিত গল্প আছে, শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন করে— ৩০টি ভেড়ার মধ্যে ২টি বেড়া টপকালে কটি থাকবে? অঙ্কের হিসেবে একজন বাদে সকলেই ঠিক উত্তর দেয়। কিন্তু বাকিজন বলে একটিও থাকবে না। কারণ ১টি ভেড়া বর্ডার টপকালে বাকি সবই তাকে অনুসরণ করে। এদেশের দুর্ভাগ্য, আপনাদের মতো কিছু ভেড়ার দল আমাদের দেশে এসেছে।

আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আবার আপনারা আপনাদের ছেড়ে আসা নিজ বাসভূমিতে ফিরে যান এবং সেখানে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকুন তাতে আপনাদের সেকুলারগিরি ফলাতে সুবিধে হবে।

—সঞ্জয় দত্ত,
নবাবপুর,মসাট, হুগলী।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

কুন্দর গ্রামের পৌধেওয়ালি দিদি

সুতপা বসাক ভড়

'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়'— এই প্রবাদবাক্যটির সার্থক উদাহরণ বিহারের লখিসরা জেলার চানন প্রখণ্ডের কুন্দর গ্রামের সরিতা দেবী। নকশাল প্রভাবিত অনুর্বর ক্ষেত্র কুন্দরে ছিল কেবলমাত্র রুক্ষতা। কিন্তু ব্যতিক্রম সর্বত্রই থাকে। এখানেও আছে। গাছপালা এবং প্রকৃতির প্রতি ভালবাসার অদ্ভুত সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এখানকার সরিতা দেবী। স্থানীয় মানুষজনের কাছে তিনি 'পৌধেওয়ালি দিদি।' এক লক্ষেরও বেশি গাছ লাগিয়ে তিনি ওই এলাকার চেহারাই বদলে দিয়েছেন। তার লাগানো গাছগুলো এখন বৃক্ষ হয়ে উঠেছে। সরিতা দেবী একটি নিজস্ব নার্সারি বানিয়েছেন, সেখান থেকে প্রতি বছর ২০ হাজার গাছ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কুন্দর গ্রামের পাহাড়ি এলাকাতে প্রায় পনেরো বছর ধরে ক্রমাগত বৃক্ষরোপণ করে সরিতা ওই অঞ্চলের পরিবেশ বদলে দিয়েছেন। যে অনুর্বর রুক্ষ জমি এক সময় 'লাল এলাকা' নামে পরিচিত ছিল সেই জায়গা এখন সবুজে ভরে গেছে। সরিতাদেবী এই গাছগুলির প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেন। এছাড়া খালি জায়গায় এখনও যে বৃক্ষরোপণ করে চলেছেন তাতে অন্যদেরও এই কাজে উৎসাহিত করছেন। চারাগাছের অপ্রতুলতা রোধ করার জন্য তিনি নিজস্ব নার্সারি তৈরি করেছেন।

গ্রাম্য পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠা সরিতা অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। তিনি জানান যে, ক্রমাগত গাছ লাগিয়েই সমাজে আজ তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। ২০০০ সালে বনক্ষেত্র সমিতি কুন্দরের উপাধ্যক্ষ পদে তাকে নির্বাচিত করা হয়। এরপর দল বানিয়ে বনাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে জঙ্গল ধ্বংস করার বিরুদ্ধে প্রচার চালান তিনি এবং জনমত গড়ে তোলেন। ২০০৬ সালে বনক্ষেত্র কুন্দর সমিতির অধ্যক্ষ পদের দায়িত্বপ্রাপ্তা হন তিনি। ওই এলাকার উর্বর জমি সবুজে ভরে তোলার কাজে আরও বেশি উদ্যোগী হন। তখন ৫০ হেক্টর জমিতে ৫৫ হাজার আসন, গম্ভার, বাঁশ, মধুবনী, আমলকী, খয়ের, মহুয়া, বাবুল ইত্যাদি গাছ লাগান। তারপর প্রতি বছর তিনি বৃক্ষরোপণ করতে থাকেন। এর সঙ্গে আগে লাগানো গাছগুলির নিয়মিত প্রয়োজনীয় যত্ন করতে থাকেন। সেগুলির সুরক্ষার প্রতি জনসাধারণকে সচেতন করে তোলেন তিনি। ফলস্বরূপ, তাঁর লাগানো চারাগুলো বর্তমানে মহীরুহে পরিণত হয়ে বনভূমিকে সুন্দর ও ঐশ্বর্যময়ী করে তুলেছে।

সরিতা দেবীর স্বামী পণ্ডিত পঞ্চানন্দ ২০১৬ সালে নিজস্ব পাঁচকাঠা জমিতে ২০ হাজার চারাগাছের একটি নার্সারি তৈরি করেন। এখান থেকে তিনি সব চারাগাছ বিনামূল্যে বিতরণ করেন। যারা এখান থেকে গাছ নিয়ে যায়, তারা সেগুলি সঠিকভাবে যত্নআত্তি করছে কিনা, সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখেন তিনি। সরিতাদেবীর অবদানের জন্য রাজ্যের বন ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন।

একজন গ্রাম্য মহিলার কী অসামান্য প্রচেষ্টা! নিজের পরিবারের বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে সমাজ, পরিবেশের প্রতি এইরকম দায়বদ্ধতা খুব কম মানুষের থাকে। একজন স্বল্পশিক্ষিতা মহিলা হয়েও সরিতাদেবী যে কাজ করে চলেছেন, সেই কাজের মূল্য দেশের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ আয়যুক্ত বড়ো বড়ো অফিসাররেরা শুধুমাত্র দপ্তরে বসে কাগজের ভার বৃদ্ধি করে চলেছেন তাদের চেয়ে অনেক বেশি। আজ সমাজে তাঁর কাজের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন, কিন্তু তাদের মতো মানুষেরা কিছু পাবার আশায় কাজ করেন না। তারা কাজ করেন প্রকৃতি ও মানুষকে ভালোবেসে। গাছের পর গাছ লাগিয়ে তাঁরা প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছেন; এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক মানুষজনকেও অনুপ্রাণিত করছেন। সরিতাদেবীর জ্বালানো একটি প্রদীপ থেকে আজ অনেক প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। একটি অনুর্বর লাল পাথুরে ভূখণ্ড ভরে গেছে সবুজ অরণ্যানিতে। সরিতাদেবীর এই অনবদ্য কাজের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা! ■

পেট ব্যথায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

হঠাৎ পেটব্যথা। বুঝতে পারছেন না এটি গ্যাসট্রিক নাকি অন্য কিছু। কী ওষুধ খাবেন, কার কাছে যাবেন, তাও বুঝতে পারছেন না। পেট অনেক বড়ো জায়গা। অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে এখানে। তাই পেট ব্যথার সঠিক স্থান, ধরন-ধারণ, আনুষঙ্গিক উপসর্গ ইত্যাদি মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা তো আছেই। প্রথমেই খেয়াল করতে হয় তবে, উপর পেটে ব্যথা

হচ্ছে, না তলপেটে। ব্যথাটা কোন দিকে ছড়াচ্ছে? কামড়ে ধরে আছে, না জ্বালা করছে? সঙ্গে বমি, অরুচি, পায়খানার সমস্যা ইত্যাদি আছে কি না। কোনো কিছু খেলে বাড়ে, নাকি খালি পেটে বাড়ে?

কেমন হতে পারে পেটব্যথার ধরন :

পেপটিক আলসার বা গ্যাসট্রিকের ব্যথা সাধারণত পেটের ওপর দিকে মাঝমাঝি শুরু হয়। এটি খালি পেটে বাড়ে, কখনো চিনচিনে, কখনো জ্বালপোড়ার মতো মনে হয়। এর সঙ্গে বমিভাব, টক ঢেকুর, পেটফাঁপা ইত্যাদি লক্ষণ থাকতে পারে। অ্যান্টাসিড বা অন্য গ্যাসট্রিকের ওষুধে বেশ উপশম হয়।

একই জায়গায় বা একটু বাঁ দিকে অগ্নাশয়ের সংক্রমণ হতে পারে। কিন্তু এই ব্যথা প্রচণ্ড, তীব্র, পেছনের দিকেও অনুভূত হয় এবং রোগীর ব্যথায় কুঁকড়ে যায়। সামনে ঝুঁকে থাকলে আরাম মেলে সঙ্গে বমি থাকতে পারে। ওপরে পেটের ডান দিকে ব্যথা হতে পারে পিত্তথলিতে সংক্রমণ বা পাথর থাকলে। এই ব্যথাও ডানদিকে পেছন অব্দি ছড়ায়, সঙ্গে বমি হতে পারে। বিশেষ করে চর্বিযুক্ত খাবার খেয়ে এটি বাড়ে। যকৃতের সংক্রমণেও একই জায়গায় ব্যথা হয়। চিন চিন করে ব্যথা, সঙ্গে জ্বর, জন্ডিস, অরুচি ইত্যাদি হেপাটাইটিস বা যকৃতের সংক্রমণ নির্দেশ করে। যকৃতের ফোড়া হলে এই ব্যথা তীব্র হয়। সঙ্গে কাপুনি দিয়ে জ্বর। পেটের ওপরের দিকে ডান অথবা কিডনিতে পাথর, যন্ত্রণা বা সংক্রমণ হলে সেই পাশে ও পিছনে ব্যথা হয়। এই ব্যথা ক্রমশ নীচে নেমে তলপেটেও ছড়ায়। কিডনির ব্যথা যদি ক্রমশ তলপেটের ডান দিকে ছড়িয়ে যায় এবং সেখানে হাত দিলেই ব্যথা হয়, ধীরে ধীরে তীব্রতা বাড়তে থাকে, তাহলে তা অ্যাপেন্ডিসাইটিস কি না ভাবতে হবে। তলপেটে ব্যথার সঙ্গে প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ও সংক্রমণ নির্দেশ করে। এছাড়া মেয়েদের জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের নানা সমস্যায় তলপেটে ব্যথা হতে পারে। সাধারণ আমাশয় বা ফুড পয়জনিং ও বদহজম থেকে পেটজুড়ে ব্যথা। বমি বমি ভাব, পেটে শব্দ, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি হয়। আবার কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেও পেটে ব্যথা হয়।

দীর্ঘদিনের পেটব্যথার সঙ্গে ওজন হ্রাস, রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা ইত্যাদি সতর্কতা সংকেত। অন্ত্রে ক্যান্সার বা টিবিরও লক্ষণ এই পেটব্যথা। তাই পেটব্যথাকে ছোটো করে দেখবেন না।

পেটে ব্যথা হলে শুরুতে কী করবেন :

যদি গ্যাসের কারণে পেটে ব্যথা মনে করেন এবং এর সঙ্গে অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে গ্যাসের ওষুধ দিতে পারেন। ব্যথা কমানোর জন্য অনেক ওষুধ আছে, সেগুলো দিতে পারেন। তবে নিশ্চিত হতে হবে, আপনার ঝুঁকির বিষয়গুলো হয়নি। হঠাৎ করে সমস্যা হয়েছে কিনা বমি হয়েছে কি না, জ্বর আছে কি না— এই বিষয়গুলো সঙ্গে না থাকলে খুব চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা করলেই হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

পেট বেদনা আহারের পর— আর্জ-না, ক্যাল্কে-ফ, আর্স, নাক্স-ভ, পালস, ব্যারাই-কা, সিপি-সালফ। ঘৃতপক্ক খাদ্যে পালস, ঠাণ্ডা জল পানে-একোন, আর্স, রাসটক্স। দুগ্ধপানে-ম্যাগ-মি।

পেট ব্যথা খালি পেটে—ব্যারাই-ক, ক্যাল্কে, কষ্টি, ফ্যাগো, গ্রাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, নাইট্রিক-অ্যা, পেট্রো, সোরি, রডো, সিপি।

পেট ব্যথা সম্মুখদিকে ঝুকলে উপশম— ডায়োস্ক (উল্টোদিকে কলোসিস্থ)।

পাকস্থলীর ব্যথা শীতল জলে উপশম— অ্যালুমিনা, আর্জ-না, ক্যাল্কে, কস্টি, পালস।

ব্যথা ক্ষুদ্র স্থান হতে বহু দূরে ছুটে যায়— ডায়াস্কো, বার্বা। পেট ব্যথা করলে— বোভিষ্টা, এনাকার্ড, মেডো, পেট্রে, সিপিয়া, ল্যাক-ক্যান।

কৃমিজনিত পেট ব্যথা— ক্যাল্কে-কা, স্যাবাডি, ফিলিক্স, স্ট্যানাম।

ক্রোধজনিত পেট ব্যথা—কলোসিন্থ। শীতল পানীয় সেবনে— অ্যাকো, আর্স, রাস।

আহার মাত্র পেট ব্যথা— ক্যাল্কে-ফস। উপবাসজনিত পেট ব্যথা— গ্রাফ, ল্যাকে, পেট্রো।

চর্বিযুক্ত দ্রব্য-সেবনে— পালস। ফলমূল খেয়ে পেট ব্যথা— কলোসিন্থ, চায়না, পালস, লাইকো, ভিরে।

ভয় পাবার পর পেট ব্যথা— গ্লসিয়া, প্লাটিনাম। কুলপি বরফ খেয়ে পেট ব্যথা— আর্স, ইপি।

মাংস খেয়ে পেট ব্যথ— কেলি-বা। দুধ খেয়ে পেট ব্যথা— ম্যাগ্নে-মি, সালফ। আলু খেয়ে পেট ব্যথা— অ্যালুমিনা, কলোসিন্থ।

গল্প

আত্মহত্যা

সুজিত রায়

সেই শব্দটা আবার।

গভীর রাতের অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে সেই একই শব্দ খটা...খট...খটা...খট...টুং...টাং...টুং...টাং— একে অপরের সংগীতের সঙ্গে সঙ্গতের মতো।

ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল অঞ্জলি। মশারি সরিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেয় পা রাখতেই গোটা শরীর জুড়ে বয়ে গেল শীতল তরঙ্গ। বরফের মতো ঠাণ্ডা একঝলক বিদ্যুৎ যেন।

অঞ্জলি জানে, জানালা খুললেই ওর ঘুমজড়ানো চোখের সামনে দিয়ে ছুটে যাবে শ্বেতশুভ্র একজোড়া ঘোড়া। তাদের পায়ের খুরের শব্দ আর গলার ঘণ্টির আওয়াজে গলি মুখরিত করে ছুটে যাবে সেই সোনালি বর্ডার দেওয়া সাদা ফিটন। সহিসের আসনে যে বসে থাকে, সেই ওমর কিনা বোঝা যায় না। তবে অনেকটা সেরকমই— মাথায় ঝোলা পাগড়ি। শরীর ডোবা জোব্বায়। হাতের ছিপ্‌টি বাতাস কেটে যায় শন্‌শন্।

জানালার পাল্লা খুলতেই হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকে পড়ল এক ঝাঁক কুয়াশা। যেন অপেক্ষা করেই ছিল এতক্ষণ। যেন জানতো, অঞ্জলি জানালা খুলবেই।

আর তখনই কুশায়ার চাদর ছিঁড়ে ছুটে এল সেই ফিটন— যেন কতকালের চেনা।

ছুটে এল। কিন্তু থামল না। যেমন চলে যায় কাউকে তোয়াক্কা না করে, তেমনি চলে গেল প্রতি রাতের মতোই। গত দু' বছর ধরে এমনি দেখছে অঞ্জলি।

আর তারপরেই চোখ থেকে উধাও হচ্ছে ঘুম। বাকি রাত সঙ্গীহীন শয্যায় শুধু এপাশ আর ওপাশ।

অঞ্জলি জানে, এবার পায়ের চেটো থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসবে সেই অসহ্য অনুভূতি। চিনচিন করে উঠবে উরু জঙ্ঘা, কোমর, হাতের চেটো, বুক, পিঠ, ঘাড়। মেরুদণ্ডের পাকদণ্ডী বেয়ে চলবে লকলকে অগ্নিশিখার নাচন। অসহ্য।

উঃ! মাগো!

শুরু হয়ে গেছে যন্ত্রণাটা। গত দু'বছর ধরে ওই যন্ত্রণাটা এতই চেনা হয়ে গেছে যে, যেদিন আচম্বিত যন্ত্রণাটা আসতে ভুলে যায়, সেদিন মনে হয় শরীর থেকে কিছু একটা হারিয়ে গেছে। যার থাকার কথা ছিল। কিন্তু নেই। অসহ্য হলেও তাই মুখ বুজে সহ্য করে অঞ্জলি। কারণ ও জানে, মানেও, ওই যন্ত্রণাটাই ওর আজ সবচেয়ে বেশি দরকার। ওটাই ওর আশ্রয়।

রোজের মতোই ভোর হয়। অঞ্জলি চেয়ে চেয়ে দেখে নতুন দিনের সূর্যকে।

নতুন।

অঞ্জলি হাসে। আপনমনে। তারপর বিছানায় উঠে বসে। প্রভাস তখনও বিছানায়। অন্য খাটে। ঘুমোচ্ছে। ঘুমোবে আরও অনেকক্ষণ। ডাক্তার বলেছে, রোজ রাতে একটা করে ঘুমের ট্যাবলেট খেতে।

প্রভাস খায়। বেশিরভাগ দিনই একটার বেশি ট্যাবলেট খায় আর ঘুমোয়। প্রায় সারাদিনই। মানুষটা যে ঘরে আছে, সেটা বোঝাই যায় না।

বরানগরের গোকুলবাবুর বাজারের তিন মাথার মোড়ে এই পুরনো আমলের বাহির ঘর—ভিতর ঘর। বাড়িটায় অঞ্জলি যেদিন প্রথম পা রাখে, সেদিন অথর্ব শাশুড়ি চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে দিয়ে বলেছিল— 'বউমা, এই ঘরদোর, এই সংসার এখন থেকে তোমার। তোমার চলাই হবে আমাদের চলা।'

শাশুড়ি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন সংসার থেকে। ঠাকুর-দেবতা আর নাতি-নাতনিদের নিয়েই থাকতেন দিনভর। শ্বশুরমশাই তার আগেই সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে— পৃথিবী থেকেই।

সকালে চাকরি, সংসারের জোয়াল টানতে বিকেলে পার্টটাইম। প্রাণঘাতী যক্ষ্মারোগের বীজ তাঁর জীবনকে খেয়ে নিয়েছিল কুরে কুরে। প্রভাস তখন সবে চাকরি পেয়েছে। মালগাড়ির গার্ড। কবে বাড়ি থাকে না থাকে, ঠিক নেই।

তবু চলছিল। মোটামুটি ঠিকঠাকই। দু-চার বছর বাদে প্রভাস ছোটো ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছিল ডোমজুড়ে এক গরিব বাপের মেয়ের সঙ্গে। বলেছিল— অঞ্জলি, তোমার সঙ্গী এনে দিলাম।

এক দোর, এক হাঁড়ি। কচিকাঁচায় কিলবিলে ঘরদুয়ারে সুখের হাওয়া। সদ্য বিয়োনো পোয়াতি মায়ের মতো। হু হু করে সবাই বেড়ে উঠছিল অশ্বত্থ চারার মতো। শুধু বাড়েনি ঘর, বারান্দা।

রোদ পড়েছে বারান্দায়। সকালের হলুদগোলা জলের রঙের রোদ। প্রায় নিভু নিভু শরীরটাকে টান টান করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল অঞ্জলি। কলতলায় ছোটোবউ বোধহয় কাপড় কাচছে। জলের শব্দ খুব চেনা। চল্লিশ বছর ধরে চেনা।

দোতলায় কলতলা নেই। নীচে নামতে হবে। সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায় অঞ্জলি। হাত বাড়ায়। কেউ যদি একটু ধরত। হাতে ঠেকে সিঁড়ির হাতল। রংচটা, এবড়ো খেবড়ো, হাতের চেটোয় বেঁধে শুঁয়োপোকার মতো। তবু বন্ধুর মতো। এক পা এক পা করে নামতে থাকে অঞ্জলি। অনন্তকাল ধরে ওপরে ওঠার সময়ও তাই। সময় যেন দুরন্ত ছেলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে যায় শীত। গ্রীষ্ম, বসন্ত।

—একটু সরুন তো। সক্কালবেলাই সিঁড়ি জড়ো করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে। আমাদের তো কাজ আছে। ছোটো বউ প্রায় ধাক্কা দিয়েই সদ্য ধোওয়া বাসি জামাকাপড় মুখের ওপর বুলিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যায়। বোধহয় ছাদেই।

অঞ্জলি সরে দাঁড়ায়। ওর কোনো কাজ নেই। শুধু একটা অনুভূতি। একট চিনচিনে যন্ত্রণা— যেন একটা দিঘল জ্যান্ত সাপ শিরায় শিরায় তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বিষ ঢালতে ঢালতে চলেছে।

রান্নাঘরটা এখান থেকে দেখা যায় স্পষ্ট। করুণা এখনও আসেনি। এলে একটু চা পাওয়া যেত। বড়ো বউ তো এখনও ওপরেই। নামবে সেই ন'টায়। এত বেলায় ঘুম থেকে... কেন কে জানে!

কলতলায় ধীরে ধীরে মুখহাত ধুয়ে উঠোনে দাঁড়ায় অঞ্জলি। অভ্যাসবশেই পা বাড়ায় ঠাকুরঘরের দিকে যেখানে হয়তো প্রতিষ্ঠিত গোপালকে শয্যা থেকে তোলাই হয়নি। পা বাড়িয়েও পিছিয়ে এল— না থাক, বাসি কাপড়ে...

চোখের সামনে সব যেন পোর্টেবল স্ক্রিনের মতো। আসে আর সরে সরে যায়। ওই রান্নাঘর, ওই ঠাকুরঘর— সব কি ইতিহাস হয়ে গেল শাশুড়ি মায়ের মতো?

ইতিহাস ছাড়া আর কী! তা না হলে দুলু-টুলুর মধ্যে কথা বন্ধ— ভেবেছে কেউ কোনওদিনও। একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খাওয়া, খেলা, স্নান করা পুকুর তোলপাড় করে।

আজ ওরা কেউ কারও দিকে তাকায় না। অথচ রাত কাটে এক দেওয়ালে। দিন কাটে সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো বাড়ির আলো-হাওয়ায় এ হাওয়া কেমন হাওয়া!

দোতলার ঘরে ঢুকতেই কেমন একটা দম বন্ধ করা হাওয়া আছড়ে পড়ে মুখের ওপর। জানালা বন্ধ। সবকটা। বিছানার চাদর ময়লা। বালিশ, মশারি তেলচিটে। শাড়ি ব্লাউজ কবে পরেছিল, মনে নেই। একেই কি বলে পূতিগন্ধ?

করুণা এসে চা দিয়ে গেল। আপনমনেই একটু মুচকি হাসল অঞ্জলি। এবার প্রভাসের ঘুম ভাঙবে। বিছানায় বসেই চা খাবে। তারপর হাতড়ে হাতড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে। ব্যস ওইটুকুই। আবার ফেরত সেই বিছানায়। কতবার বলেছে, 'যাও না, একটু বাইরে ঘুরে এস।' বলাই সার। আজকাল আর বলে না। বলে কী লাভ। নিজেই কি যায়? নিজেও কি দেখেছে পাড়ার অলিগলিগুলো কেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছে? পাড়ার সেই সব কচি মেয়েগুলো হয়ে উঠেছে নিতম্বিনী। অথচ তার পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে। সবাই কত বলে কদিন গিয়ে থেকে আসতে তাদের কাছে! ইচ্ছেই করে না।

চা শেষ করে অশক্ত হাতেই ঘরদোরগুলো গোছাতে থাকে। বালিশের জায়গায় বালিশ, মশারির জায়গায় মশারি। রাসু আসবে। কাল জানিয়েছে ফোনে।

পাঁচ মেয়ের মধ্যে ওই মেয়েটাই আসে কম। দূরে বাড়ি। কচি বাচ্চা। এলে ভালো লাগে। কিন্তু ওই যে— এসেই বলবে— চল মা, তোমায় চান করিয়ে দিই। চুল বেঁধে দিই। নখ কেটে দিই।' কেন রে বাবা। এসেছিস বোস দু' দণ্ড। তা না, মাকে সাজাবি। কেন দেখ-না, তোর মায়ের চুলে জটা, উকুনের ছড়াছড়ি। ঘাড়ে, পিঠে চাপ চাপ ময়লা। হাতের নখ বেড়ালের থাবার মতো। এও এক রূপ রে মা! চেয়ে দেখ ভালো করে।

তা কথা শুনবে মেয়েটা! রাগ করলে তবে স্বস্তি। দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে, তবে শান্তি। শর্বরীটাও তাই। কোলপোঁতা মেয়ে— ওই একইরকম। সেজটা কাছেই থাকে। এক পাড়াতেই। দেখেটেখে

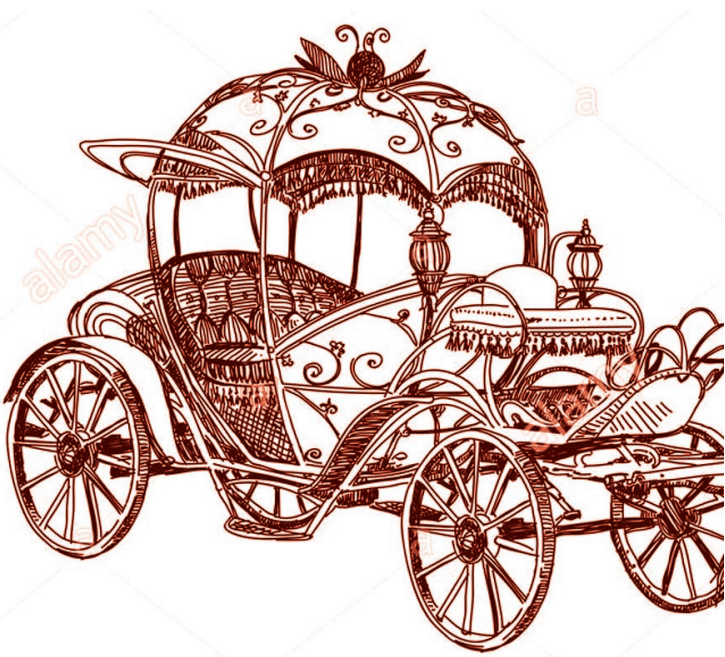

যায় প্রায়শই। বড়ো, মেজো— ওরাও। কিন্তু ওই— আসে আর যায়। অঞ্জলির শরীরে কিন্তু থেকেই যায় চিনচিনে ওই অনুভূতি— যন্ত্রণা।

অঞ্জলি ঘরের মধ্যে পায়চারি করে। প্রভাস তাকিয়ে দেখে। আগে তবু দু'চারটে কথা বলত। আজকল মুখে কুলুপ। বললেও ভুল-ভাল, অসংলগ্ন। নিজেই বলে নিজেই হাসে। অঞ্জলি তাকিয়ে দেখে। শুধু দেখে। একটু যদি ছোঁয়া যেত ওকে!

এই পোশাকে! এই জটা মাথায়! ছিঃ!

দুলু অফিস বেরোচ্ছে। একটু পরেই বেরোবে টুলু। মুখোমুখি যাতে হতে না হয়, তাই দুজন দুপথে যায়। একজন সোজা, অন্যজন ঘুরপথে। আর তারপরেই শুরু হয় বউয়ে-বউয়ে জল নিয়ে কাড়াকাড়ি, গলমন্দ। সবই পরোক্ষে— ভাববাচ্যে। মানহানি মামলা যাতে না হয়। কেউ বলেই যায়। কেউ বলতে বলতেই ঘরে খিল দেয়। অঞ্জলি তাকায়, শোনে। আর যন্ত্রণাটা ছড়াতে থাকে শরীরের কোষে কোষে।

বাড়িটা নাকি ভাগ হবে এবার। কথাটা কানে এসেছিল ক'দিন আগেই। সন্ধ্যেয় ওরা বাড়ি ফেরার পর কথা কাটাকাটি শুনে নিশ্চিত হলো শুধু ভাগ নয়— বাড়িটা ভেঙেই ফেলা হবে। প্রমোটরের সঙ্গে কথা চলছে। দুলু, টুলু আর দেওরের ছেলে বাপি পাবে তিন টুকরো ফ্ল্যাট। আর মেয়েরা। ওই নিয়েই চলছে বচসা— জোর কাজিয়া।

জানালায় কান পেতে শোনে অঞ্জলি। অস্পষ্ট। ঠিক বোঝা যায় না। বোঝা যায়, তর্কাতর্কি শুধু বাড়ছে। মাঝে মাঝে বাড়ির তিন বউয়ের গলাও শোনা যাচ্ছে। প্রভাস বিছানাতেই। ওর কানে কী ঢুকছে কিছু?

—শুনছ!

প্রভাস ঘাড় ফেরায়।

—শুনছি।

—বাড়িটা নাকি ভেঙে ফেলা হবে?

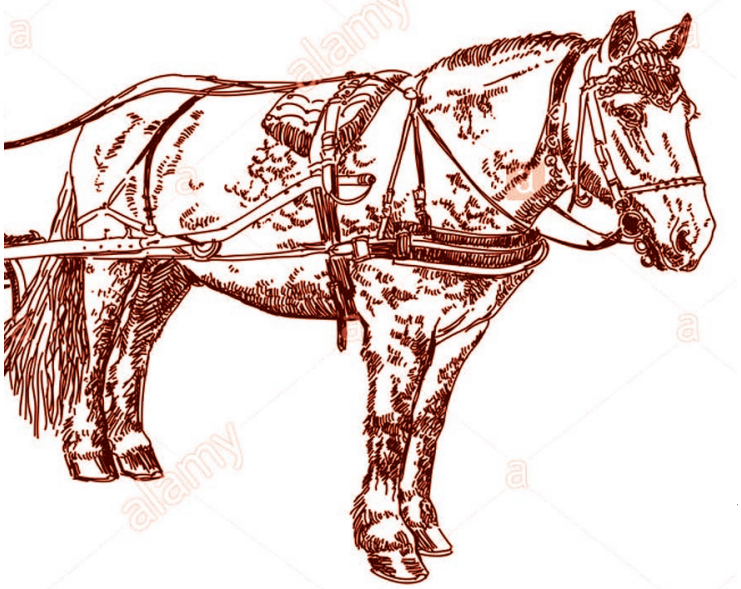

আমরাও তো সব টুকরো টুকরো!

নিজের শীর্ণ দীর্ণ হাতে হাত বোলায় অঞ্জলি। মনের মতো শরীরটাও বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কোথাও জোর নেই। সব যে যার সে তার।

ছোটো দেওরের ছেলে বাপি সখ করে বাবা মায়ের জন্য ঘর করে দিয়েছিল তিন তলায়। নিজের ঘরের পাশেই। জল, বাথরুম সব হাতের কাছে। কদিন আগে বাপির বউ শ্বশুরকে হাত ধরে নামিয়ে দিয়ে গেল দোতলার সেই ছাদ ফুটো ঘরে। এখন কর্তা গিন্নি দুজন ওই ঘরেই। হাতের কাছে না জল, না বাথরুম।

সব টুকরো টুকরো— ছড়ানো ছেটানো ইতস্তত। কেউ কারো নয়। সব এক একটা দরজা বন্ধ ফ্ল্যাটের মতো। দেওয়ালে এক গাঁথুনি। মনের গাঁথুনিটাই শুধু নেই।

জানালার শিকের ফাঁকে ফাঁকে ছেঁড়া ছেঁড়া আকাশ। রাত ঘনিয়ে আসছে। বচসা থেমে আসছে। বোধহয় রফা হয়ে গেল। বাড়িটা মাঠ হয়ে যাবে। পোয়াতি রাত বিয়োতে না বিয়োতে ফের সেই আওয়াজ।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে অঞ্জলি। কান পেতে শোনে। সেই খটা...খট...। সেই টুং...টাং...!

ছুটে গিয়ে জানালার পাল্লা খোলে অঞ্জলি। হ্যাঁ ছুটেই! ওই তো সেই সোনালি বর্ডার দেওয়া ফিটন। হ্যাঁ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওমরের হাতের ছিপটি ঘুরছে বাতাস কেটে শনশন। ঢাক্কন খোলা সাদা গদির ওপর বসে আছে ফুটফুটে অঞ্জলি। গায়ে গাদা ফ্রক। মাথার বেণীতে সাদা রুমাল। ভোরের আলোয় ঝকঝক করছে। জোড়া ঘোড়ার খুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাত পা নড়ছে আর গাইছে।

অঞ্জলির মুখে চাঁদের আলো। কুয়াশার চাদর যেন হঠাৎই অপসৃত। আহা! কী আনন্দ! কী অপার সুখ! আসছে! আসছে ওমরের ফিটন। শ্বেতশুভ্র দাড়িতে ঢাকা প্রশস্ত চেহারার ডাক্তার দাদু অঞ্জলির বুকে স্টেথো ঠেকিয়ে বলছে : শ্বাস নে। জোরে জোরে। আরও জোরে। আরও আরও জোরে।

শ্বাস নিচ্ছে অঞ্জলি। বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে। ঘর ভরে যাচ্ছে ভোরের শিউলির সুগন্ধে। আলোয় ভরে যাচ্ছে অঞ্জলির পৃথিবী। গোটা শরীর থেকে হু হু করে নীচের দিকে নামছে সেই চিনচিনে যন্ত্রণাটা। যেন পালাবার তাড়া। মাথার জটায় ঢেউ খেলছে কালো চুল। হাত পা মুখ গোটা শরীর ঝকঝক করছে চাঁদের আলোয় দু' বছর আগের মতো। অঞ্জলি হাসছে গোটা শরীর দুলিয়ে।

লাশটা পড়েছিল জানালার পাশেই। চোরের মতো শিশির ঢুকে ভিজিয়েছে ভিজে ন্যাতার মতো পড়ে থাকা শরীরটাকে। ডাক্তারবাবু এসে বলে দিয়ে গেছেন— সব শেষ। সম্ভবত কার্ডিয়াক অ্যাটাক। ছেলেরা, বউরা, মেয়েরা, জামাইরা সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কারো চোখ ভিজে, কারও গোটা মুখেই বোঝা যায় কলতলার জল।

প্রভাস বিছানাতেই। ওখান থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে শুকনো চোখে দেখে নিল একবার। তারপর বলে উঠল ছেলে-মেয়েদের— তিন দিনে কাজ করিস। এটা আত্মহত্যা!

গল্প

মেঘমল্লার

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

—বাণী, অ বাণী, সত্যি করে বল না, তুই আমাকে ভালোবাসিস কিনা।

—উফফ, বারবার এই একই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন শুনি।

—বড়ো জানতে ইচ্ছে করে রে। একবার বলে ফেল, তা'লে আর জিগ্যেস করব না।

—কতদিন বলেছি না, বার বার এই একই কথা জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে। ভালো লাগে না। আর তাছাড়া এসব জেনেই বা তুমি কী করবে শুনি।

—কিছু না, শুনে রাখব। আসলে তুই ভালেবাসিস কিনা জানলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই।

—হুঁঃ, নিশ্চিন্ত হই! নিজেকে দেখেছ একবার? কে ভালেবাসবে তোমাকে?

—ও, মুখে এই বসন্তের দাগের কথা বলছিস তো? এটা কি আমার দোষ তুই বল? ছেলেবেলায় বসন্ত হলো, সে দাগ আর মেলালো না। মা তো তখন কত চেষ্টা করেছিল। সে দাগ ওঠাতে পারল না।

—আমি বসন্তের দাগের কথা বলছি না।

—তা'লে কী বলছিস?

—এই যে ঝাকড়া ঝাকড়া চুল, দাড়ি কামাওনি ক'দিন। জামা কাপড়টাও তো কেমন ময়লা। এগুলো দেখ না?

—ও এই বলছিস। তা হ্যাঁ, চুলটা বেশ ক'দিন কাটা হয়নি। আর দাড়ি কাটতে কার রোজ ভালো লাগে বল তো?

—তার মানে এরকম নোংরাই থাকবে তুমি?

—না, না নোংরা থাকব কেন? এখন তো পকেটে পয়সা নেই। পয়সা একটু জমুক, তারপর চুলটা কেটে ফেলব।

—পয়সা আসবে কোথা থেকে? সারাদিন মাঠেঘাটে উড়নচণ্ডীর মতো ঘুরে বেড়াও। কাজটাজ তো কিছু কর না। পয়সা আসবে কোথা থেকে শুনি।

—কে বলল তোকে আমি কাজ করি না। তুই জানিস আমি কী কাজ করি?

—কী কাজ কর? শুনি তো দেখি।

—আমি বাতাস বিক্রি করি। বিশুদ্ধ বাতাস।

—বাতাস বিক্রি কর? পাগলের মতো কথা বলার জায়গা পাও না?

—সত্যি বলছি রে, বাতাস বিক্রি করি। কাছে আয় বুঝিয়ে বলছি।

—না, কাছে যাব না। দূর থেকেই বল।

—একটু কাছে আয় না রে বাণী।

—না, যাব না। কাছে গেলেই তুমি হাত চেপে ধরবে। যা বলার দূর থেকেই বল।

—বেশ বেশ, তাই হোক। চারদিকে বাতাস কেমন বিষাক্ত হয়ে গেছে জানিস তো। আমি সেদিন শহরে গেছিলাম, দেখলাম লোকে নাক ঢেকে ঘোরে। তাই দেখেই না আমার বাতাস বিক্রি করার ব্যবসাটা মাথায় এল।

—তা কী করে বাতাস বেচবে শুনি?

—শোন, ওই যে শহরের লোকগুলো ওরা তো বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য ছটফট করতে করতে গাঁয়ে ছুটে আসবে। তখন আমি ওদের ধরে ধরে বোসদের বাগানে নিয়ে যাব। ওরা বুক ভরে বাতাস নেবে। আধ ঘণ্টা বাতাস নিলে একরকম টাকা। এক ঘণ্টা নিলে আর একরকম। পুরো একদিন নিলে দু' ঘণ্টা ফ্রি।

—তা তোমার বাতাস কেনার খদ্দের জুটলো?

—জোটেনি এখনো। তবে দেখবি তাড়াতাড়ি জুটে যাবে। আমি শহরে গিয়ে দেখে এলাম তো নাক ঢাকা লোকের সংখ্যা বাড়ছে। —বাতাস বেচেই চলবে তোমার?

—উফফ কী যে তুই বলিস বাণী? চলবে না মানে খুব চলবে। একদিন দেখিস বাতাস বেচেই আমার কত টাকা হয়ে যাবে। তখন কারো কাছে হাত পেতে চুল কাটার পয়সা চাইতে হবে না। তখন আমি সেজেগুজে তোর কাছে আসব।

—আর কী করবে?

—আর? আর একটা ছোট্ট বাড়ি বানাব। বাড়ির উঠোনে লাউমাচা। গন্ধলেবু গাছ। দু' চারটে নারকেল আর আম। তুই চাইলে একটা জামগাছও লাগাতে পারি। শীতের সময় কপি আর টমাটো ফলাবো। ধনেপাতা, পালংশাক। আর...আর...ও হ্যাঁ, বাড়িতে ঢোকার মুখে একটা কৃষ্ণচূড়া।

—আর?

—আর একটা ছোট্ট তুলসীতলা থাকবে।

—আর?

—বাড়ির পিছনে একটু পুকুর কাটাব বুঝবি। পুকুরে হাঁস সাঁতার কাটবে। তুই দুপুরবেলা চই চই করে ডাকবি। ওরা এসে তোর হাত থেকে খাবার খেয়ে যাবে।

—আর?

—আর একটা জিরাফ পুষবো।

—এ মাগো, বলে কী! কুকুর বিড়াল কিছু না। কোথা থেকে একটা তেঢ্যাঙা জিরাফ পুষবে!

—জিরাফ তোর ভালো লাগে না বাণী? খুব ছোটোবেলায় আমি একবার বাবার সঙ্গে কলকাতার চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে জিরাফ দেখেছি। কী লম্বা গলা, গায়ে ছোপ ছোপ দাগ। বিকেলের আলো এসে পড়েছিল জিরাফের গায়ে। কী যে অপূর্ব লাগছিল জিরাফকে সে তোকে কী বলব বাণী!

—তুমি এসব পাগলামি কবে বাদ দেবে পরাশরদা?

—তুই একে পাগলামি বললি বাণী? কেন, বাতাস বিক্রি করে বড়োলোক হওয়া যায় না? বাতাস বিক্রি করে বাড়ি বানানো যায় না? জিরাফ পোষা যায় না?

—না, যায় না। ওসব ফালতু চিন্তা। শুধু আমি বলছি না। তুমি যাকে খুশি জিগ্যেস কর সেই বলবে।

—সবাই তো আমাকে তাই বলে রে বাণী। বলে, পরাশরটার ছোটোবেলা থেকে বুদ্ধি বাড়েনি। আমার যদি বুদ্ধি না বাড়ে, তাহলে আমি কী করি বল তো?

—কে বলল তোমার বুদ্ধি বাড়েনি? তোমার বেশ বুদ্ধি বেড়েছে। না হলে আমাকে এভাবে বিয়ে করতে চাও? আমার হাত ধরার জন্য এর'ম ছুকছুক কর!

—ও বাণী, এবার অন্তত সত্যি করে আমাকে বল তুই আমাকে ভালোবাসিস কিনা।

—কোন দুঃখে তোমাকে ভালোবাসতে যাব বল দেখি?

—আমাকে ভালোবাসবি না? তাহলে তুই কাকে ভালোবাসবি?

—আমার জন্য রাজপুত্তুর আসবে। ঘোড়ায় চড়ে। টগবগ করে। তারপর আমাকে তুলে নিয়ে যাবে।

—তারপর?

—তারপর যেতে যেতে যেতে যেতে আমরা একটা ঘুমের দেশে পৌঁছব। সেখানে রাজপুত্তুরের সঙ্গে রাক্ষসদের খুব যুদ্ধ হবে।

—তারপর?

—তারপর আর কী? সব রাক্ষস মারা যাবে আর রাজপুত্র আমাকে বিয়ে করবে। রূপকথার গল্প পড়নি বুঝি!

—আহ্, আবার তোর সেই একই কথা। কী করে আমি পড়ব বল দেখি? ছোটোবেলা থেকে কি আমার বুদ্ধি বেড়েছে।

—এখন পড়বে। ঠিক পড়তে পারবে তুমি। এখন তোমার বুদ্ধি বেড়েছে।

—কী করে বুঝলি তুই বুদ্ধি বেড়েছে?

—বুদ্ধি না বাড়লে কেউ হাওয়া বেচার কথা ভাবতে পারে?

—তা'লে তুই বল ব্যবসাটা কেমন ফেঁদেছি।

—কিন্তু এ ব্যবসা করে তোমার বাড়িও হবে না, জিরাফও হবে না।

—আমি তো আর অন্য কিছু করতে পারব না রে বাণী।

—পারবে, পারবে, আমি দেখিয়ে দেব, ঠিক পারবে।

—কী ব্যবসা করব তুই বল?

—ইস্টিশনের বাইরে আমার যে ভাতের হোটেলটা আছে, তার পাশে একটা পান-সিগারেটের দোকান দেবে?

—ও বাবা, দোকান খুলতে তো অনেক টাকা লাগে রে বাণী। অত টাকা আমাকে দেবে কে?

—আমি দেব। আমি ভাতের হোটেল চালিয়ে টাকা জমিয়েছি কিছু। আমি দেব। একটা পান-সিগারেটের দোকান করে দেব তোমাকে।

—চলবে?

—কী বল চলবে না? আমার দোকানে যারা সকালে চা খেতে আসে, বা দুপুরে ভাত— খেয়ে উঠেই তাদের সিগারেট চাই। তা পাশেই একটা পান সিগারেটের দোকান থাকলে তারা তো ওখান থেকেই কিনবে।

—কিন্তু আমি হিসাব রাখব কীভাবে? আমার তো মাথায় বুদ্ধি নেই।

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শুধু দোকানে বসবে। হিসেব আমি রাখব। পাশেই তো আমি থাকছি।

—কেউ যদি আমাকে ঠকায়?

—ঠকিয়ে পার পাবে? আমার নাম বাণী। বলে দিচ্ছি, অ্যাঁ।

—বেশ হবে তাই না। আমি আর তুই পাশাপাশি দোকান করব।

—হ্যাঁ, দেখবে, দোকান খুব চলবে তোমার, অনেক টাকা হবে।

—তখন একটা বাড়ি বানাব আমি কেমন?

—হ্যাঁ। ছোট্ট বাড়ি। বাগানে লাউমাচা। গন্ধলেবু গাছ।

—দু' চারটে নারকেল আর আম। একটা জামগাছ কি লাগাব?

—তা লাগাতে পার। তবে শীতের সময় টমাটো, কপি, ধনে, পালং শাক করতে হবে।

—একটা কৃষ্ণচূড়া থাকবে বাড়ির সামনে।

—একটা পুকুর। তাতে হাঁস চরবে। দুপুরে খাবার হাতে নিয়ে আমি হাঁসদের ডাকব— চই চই, আয় আয়...

—আর একটা তুলসীতলা। রোজ সেখানে সন্ধেবেলা তুই প্রদীপ দিবি।

—অনেক রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, আকাশ ভর্তি শুধু তারা, তখন তুমি আমার কোলে মাথা রেখে শোবে। আমি তোমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে গান গাইব। কোন গানটা বল তো...

—বাণী... অ বাণী... তার মানে তুই তো আমাকে ভালোবাসিস!

—মরণদশা...

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

রেঙে ওঠা ও রাঙিয়ে তোলার উৎসব

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রঙে ভুবন ভরিয়ে দেওয়ার এক সুতীব্র আকুতিতেই ইন্দ্রধনুর সাতটি রঙের বাহার প্রকৃতির বুকে। মধুমাসের সূচনায় ওই রঙের আবেশে বক্ষ তখন দুরুদুরু, এক অপার্থিব পুলক আসছে। সেই আনন্দঘন মুহূর্তেই আসে দোল। রেঙে ওঠার ও রাঙানোর উৎসব এই দোল।

দোল হলো মূলত রাধা-কৃষ্ণের লীলারঙের একটি তরঙ্গ। প্রথমিকভাবে এটি হলো একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মন্দির থেকে বের করা হয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে। দোলমঞ্চে দোলায় স্থাপন করা হয় যুগল মূর্তিকে অথবা শুধুই নারায়ণ শিলাকে। পুজোর অঙ্গ দোলায় বিগ্রহকে দোল দেওয়া। পূজো শেষে আবিরে রাঙানো হয় বিগ্রহকে। আর তারই পরে ধর্মের আঙিনা ছেড়ে একটি বৃহৎ লৌকিক উৎসবে পরিণত হয় দোল। রঙের খেলায় মেতে ওঠে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই।

প্রাকৃতজনের সেই রঙের খেলায় বস্তুত থাকে না কোনো জাতপাত অথবা বয়সের ভেদাভেদ। এই রঙের উৎসবের অন্যতম অঙ্গ সংগীত। কখনও একক, তবে বেশিরভাগ সময়ই সময়ই সংগীতের লহরীতে মত্ত হয় জনচিত্ত। দোল যদি হয় জল-রঙের খেলা, তবে বিকেল সন্ধ্যায় শুধু ফাগ ওড়ানো। সুগন্ধি অবিরের উৎক্ষেপে বিকেল থেকেই যেন চারিদিকে নেমে আসে এক সুগন্ধির হালকা কুয়াশা। তারই মধ্যে বৈঠকি গানের আসর।

এমনটাই ছিল কিছুদিন আগেও। এখন সে রূপ লেগেছে বিবর্তনের ছোঁয়া। একদা এই আসর মুখরিত হতো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিহারের পার্থিব-অপার্থিব রূপ নিয়ে কীর্তন-ভজন ও বৈঠকি গানে। এখনও তাই হয়। তবে বদলে গেছে সংগীত পরিবেশনের রূপ ও ধারা। নাগরিক সংস্কৃতি বদলে দিয়েছে এই সংগীতের বিষয় এবং আঙ্গিককেও। কিন্তু অন্তরলোকে বয়ে চলেছে সেই একই সনাতনী সুর। একই আনন্দতরঙ্গ যেন ওঠে উথলি উথলি।

দোল রঙের উৎসব। কিন্তু এটাই একমাত্র সংজ্ঞা নয় দোলের। দোল হলো মিলনের উৎসব। এই মিলন শ্রীমতী রাধাসহ গোপীজনের সঙ্গে নটবর শ্রীকৃষ্ণের। এই মিলন পুরুষ ও প্রকৃতির। এ মিলন ভগবানের সঙ্গে ভক্তের। এ মিলন দেবতার সঙ্গে মানবের। এই মিলন প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের। এই মিলন মানুষের সঙ্গে মানুষের। ওই মুহূর্তে সবধরনের ভেদাভেদ মুক্ত মানবমনের এ এক অপূর্ব মহা-মিলন।

পুরাণ কথা, বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার একটি তরঙ্গ এই দোল উৎসব। রাধা এবং গোপিনীরা সবসময়ই ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। তাঁদের চিত্তবাসনা মেটাবার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কার্তিকী পূর্ণিমায় রত হয়েছিলেন রাসলীলায়। তারপরও আরও অন্তরঙ্গ হওয়ার বাসনা জাগে তাদের চিত্তে। আর সেই চিত্ত-রঞ্জনের জন্যই কৃষ্ণ মাতেন আর এক লীলায়। তারই নাম দোললীলা। এই লীলায় সক্রিয় অবশ্যই গোপ-গোপিনীরাই। ফাল্গুনের সেই পূর্ণিমা তিথিতে প্রত্যহের মতোই কৃষ্ণ এবং গোপবালকরা গিয়েছিলেন গোঠে গো-পাল নিয়ে গো চারণে। প্রতিদিনের মতোই সেদিনও সবৎসা গাভীদের মাঠে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা মেতে ওঠেন ক্রীড়ারঙ্গে। এদিন গোপ বালক-বালিকারা রাধা ও কৃষ্ণকে দোলায় বসিয়ে দিতে থাকে দোল।

দোল-দোল-দোল! দে দোল—দোল! দোলায় বসে দোল খেতে খেতে রাধা-কৃষ্ণ যেমন আবেশবিহ্বল, গোপ, গো, বালকরাও ক্রীড়াকৌতুকে অনাবিল আনন্দে মত্ত। সেই আনন্দকে আরও রূপ ও রঙ্গময় করতেই অকস্মাৎ তারা ওই যুগলমূর্তিকে রাঙিয়ে তোলেন প্রাকৃতিক নানা রঙে। রাধা-কৃষ্ণকে রং দিতে দিতেই তাঁরা পরস্পরের দিকেও বর্ষণ করতে থাকেন নানা রঙের বারিধারা। রঙিন হয়ে ওঠার সেই মুহূর্তটিই সূচিত করে পরবর্তী দোল উৎসবের। সখ্য ও প্রেম রঙের যে এক আশ্চর্য মিলন মেলা।

দোল একটি সর্বভারতীয় উৎসব। ফাল্গুনী চতুর্দশী পূর্ণিমা তার পরদিন পর্যন্ত এই উৎসবের ব্যাপ্তি। প্রথম দিন চাঁচর তাকে কেন্দ্র করেই বহ্নুৎসব। এদিন রাধা-কৃষ্ণ এবং নারায়ণের বিশেষ পূজো শেষে শুরু হয় বহ্নুৎসব। বঙ্গদেশে যার পরিচিতি বুড়ির ঘর পোড়ানো বা নেড়াপোড়া নামে।

পাটকাঠি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বিশেষ ঘরে আগুন দিয়ে সমাপ্তি চাঁচরের। তারপরই ছেলেপিলেদের বড়ো সাধের নেড়াপোড়া। সারা বছরের যাবতীয় আবর্জনা, বাঁশ কাঠ, ইত্যাদি নানা দাহ্য পদার্থ দিয়ে রূপ দেওয়া হয় একটি মূর্তির। তারপর তাতে আগুন দিয়ে বালকদলের উচ্ছ্বাস এবং ছড়া কাটা—

আজ আমাদের নেড়া পোড়া
কাল আমাদের দোল
এখন বদন ভরে বলো সবাই
শুধু হরিবোল—হরিবোল।

ওই আগুনেই পোড়ানো হয় সদ্য খেত থেকে ওঠা আলু। তারপর সেই আলু পোড়া দিয়ে শুরু হয় যেন এক গণভোগ। এই যে বুড়ি পোড়ানো—তার মধ্যে যেন দেখা যায় দশেরার রাবণবধের প্রতিরূপ।

অবাঙ্গালিরা এই আগুন খেলায় ব্যবহার করেন আখ এবং রবিশস্য ছোলা। আখ একবারে মাথার পাতা সমেত এবং কাঁচা ছোলা সমেত ছোলাগাছ আগুনে আহুতি দেওয়া তাঁদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

কেবল তাই নয়, এই বহ্নুৎসবের সময়ই মাঠ থেকে কেটে নেওয়া গম এবং অনান্য দানাশস্যের গাছের গোড়া ইত্যাদি কৃষি বর্জেও দেওয়া হয় আগুন। আগুনে ভস্মীভূত ছাই সার হিসেবে বাড়ায় খেতের উর্বরাশক্তি। অন্যদিকে ওই আগুনে পুড়ে ছাই হয় অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়। ফলে প্রকৃতি হয় নির্মল। তবে ব্যাপক হারে গম ইত্যাদি রবিশস্যের অবশিষ্ট বা খড় পোড়ানোর ফলে আবার ধুনো এবং ধোঁয়ায় ঘটে বায়ুদূষণও।

বহ্নুৎসব সম্পর্কেও রয়েছে এমনই একটি কাহিনি। বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণু ভক্ত। আর সেটাই ক্রুদ্ধ করে তোলে হিরণ্যকশিপুকে। নানাভাবে চেষ্টা করেন তিনি প্রহ্লাদকে হরিনাম ভোলানোর জন্য। নানা ষড়যন্ত্র করেন। এমনকী শেষে পুত্রকে হত্যার চক্রান্ত করতেও দ্বিধা করেন না হিরণ্যকশিপু। বিষপ্রয়োগ, পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া, মত্ত হাতির পায়ের তলায় পিশে মারা ইত্যাদি আরও বিভিন্নভাবে। অবশেষে শরণ নেন তিনি হোলিকার।

হোলিকার পরিচয় সম্পর্কে শোনা যায় বিভিন্ন কথা। কেউ বলেন, হোলিকার তাঁর অন্যতম সহচরী এক রাক্ষসী। আবার কারো মতে তিনি রাজা হিরণ্যকশিপুর বোন। হোলিকা বিশেষ বিদ্যার সাহায্যে আগুনে অদগ্ধ অবস্থায় থাকতে পারত। তাই ঠিক হয়, এক ঘরে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে বসবে হোলিকা। তারপর আগুন দেওয়া হবে তাতে। হয়ও তাই।

এবার অপেক্ষা হিরণ্যকশিপুর। আশা, আগুনে পুড়ে মরবে প্রহ্লাদ আর হাসি মুখে বেরিয়ে আসবে হোলিকা। সত্যিই হাসি মুখে বেরিয়ে এল—হোলিকা নয়, প্রহ্লাদ। হরিনাম করতে করতে বাবাকে প্রণাম করে প্রহ্লাদ। আর ভস্মীভূত হয়ে যায় হোলিকা। সেই ঘটনা স্মরণেই এই বহ্নুৎসব বা বুড়ির ঘর পোড়ানো।

বঙ্গদেশে এবং কিছু কিছু জায়গায় এই বুড়ির ঘর পোড়ানো হয় দোলের আগের দিন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ-সহ উত্তরভারতেও হয় তাই। তবে ওইসব অঞ্চলে দোলের নাম হোলি। আর হোলি হয় বঙ্গদেশে দোলের পরদিন। তবে কোনো কোনো বছর তিথি অনুযায়ী দোল এবং হোলি পালিত হয় একই দিনে।

দোল বা হোলি একটি বসন্তোৎসব। বাসন্তিক ফসল ঘরে তোলার সময়ের সঙ্গে যোগ রয়েছে এই উৎসবের নানাভাবেই। নতুন ফসল তোলা এবং নতুন শস্য বোনার প্রস্তুতিকালের সঙ্গেও যোগ রয়েছে এই উৎসবের। শুধু ধর্ম বা লৌকিক আচার নয়, দোলের উৎসে রয়েছে এক সামাজিক মূল্যবোধও। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক বিবর্তনেরও এক ধরনের ইতিহাস। রয়েছে নারী-পুরুষের সহজ সম্পর্কের এক উদ্ভাস। রয়েছে দেশের কৃষি এবং কৃষি সভ্যতারও এক ধরনের সংযোগ। রয়েছে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তারও কিছু প্রকাশ। রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় বসিয়ে দোল দেওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর অয়নবলয়েরও এক ধরনের আভাস দেখেন অনেকেই।

সব মিলিয়ে ভারতীয়দের জীবনে দোল শুধু রেঙে ওঠা নয়, রাঙিয়ে তোলার, সকলের সঙ্গে একাত্ম হওয়ারও অনুষ্ঠান বা উৎসব।

হোলি হ্যায়...

হোলি রঙের উৎসব। এই দিনে মানুষ নিজে যেমন রঙিন হয় ঠিক তেমনি অন্যকেও রাঙিয়ে দেয়। এই রাঙিয়ে দেওয়ার তীব্রতা আমরা পশ্চিমবঙ্গে বসে ততটা বুঝতে পারব না যতটা পারব পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গেলে। মথুরার কথাই ধরা যাক। হোলির অন্তত এক সপ্তাহ আগে থাকতে এ শহরে রঙের উৎসব শুরু হয়ে যায়। আর হোলির দিন তো রঙের প্লাবন বইতে থাকে। বাতাসে আবির আর সবার মুখে রঙিন উচ্ছ্বাস, হোলি হ্যায়...। মথুরার যমজ শহর বৃন্দাবনের হোলি ভুবনবিখ্যাত। গোটা ব্রজভূমি আবিরে আর রঙে রঙিন হয়ে ওঠে এদিন। সেই রঙ ছড়িয়ে পড়ে গোকুল, বারসানা আর নন্দগাঁওয়ে। বারসানায় রয়েছে শ্রীরাধিকার মন্দির। ভক্তেরা হোলির দিন রাধা-কৃষ্ণের দিব্যলীলা অনুভব করার জন্য এখানে আসেন। বারসানার আর একটি আকর্ষণ লাঠমারা হোলি। মথুরা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ফালেঁগাঁও। হোলির দিন প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে এখানকার মন্দিরের পুরোহিত আগুনের বলয়ের ভেতর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যান। পুরোহিত পরিবারের এক পূর্বপুরুষকে এক সাধু বর দিয়েছিলেন। সেই বরের জোরে ওই পরিবারের পৌরোহিত্য ব্রতে নিযুক্ত সদস্যদের আগুনে কোনও ক্ষতি হয় না। এমনটাই লোকবিশ্বাস। বৃজ কী হোলির মতো রংদার হোলি পালিত হয় রাজস্থানের জয়পুরেও। এই সময় কেউ যদি জয়পুরে যান, দেখতে পাবেন, সারা শহর সেজে উঠেছে। এখানকার মানুষ হোলির জন্য বিশেষ মিষ্টি তৈরি করেন। দু'দিন ধরে এখানে হোলি পালিত হয়। প্রথম দিন হোলিকা দহন। আর দ্বিতীয় দিন, হোলি হ্যায়...

আত্মপ্রকাশ

শেখর সেনগুপ্ত

ফার্লং তিনেকের মধ্যে রাধাগোবিন্দের মন্দির। লাউডস্পিকারের দৌলতে কীর্তনিয়াদের মিলিত স্বরক্ষেপ, এমনকী দর্শকাসন থেকে নিক্ষিপ্ত আবেগ কম-বেশি হানা দিয়ে যাচ্ছে সদ্য গড়ে-ওঠা হাউসিং কমপ্লেক্সে। এখানে তেতাল্লিশ লক্ষ থেকে আরম্ভ করে এক কোটি অবধি ঢালতে পারলে একটি ফ্ল্যাটের মালিকানা এসে যাবে হাতের মুঠোয়। তারপর আছে ক্ষমতাসীন দলের মস্তান-বিদায়— যাদের আনাগোনা, অভয়বাণী, অ্যালকোহলের গন্ধ... সন্দেহবাতিকদের মনকে বড়ো বিষিয়ে দেয়।

প্রথমে স্বদেশ, তার পিছনে তিস্তা এই কিছুক্ষণ আগে ঢুকেছিল জবরদস্ত প্রমোটার ভি.এল. কেজরিওয়ালার চেম্বারে। ঢুকতেই নাসায় ঝাপটা মারে রুমফ্রেশনারের কড়া গন্ধ। বিপুল বপু কেজরিওয়ালার মাথার ওপর পুষ্পশোভিত গণপতিদেব। বাতাসে তাই কিঞ্চিৎ ধূপধুনোরও সুবাস। প্রমোটারের ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত সদ্য সমাপ্ত। টেবিলের ওপর মাত্র একটি পেটমোটা হলুদ ফাইল। হাত সাফাইয়ের কত স্মৃতি মজুদ ওখানে! প্রশাসনের 'অনুপ্রেরণা'য় সকল দুর্যোগ ফুৎকারে উড়ে গেছে। ম্যানেজার-কাম-বয় অনুব্রত খাটুয়া প্রথমে টেবিল ঝাড়পোঁছ করেছে, তারপর নামিয়ে দিয়েছে এই হলুদ ফাইল, এবার প্রসপেকটিভ কাস্টমারদের জন্য ফ্লাস্ক থেকে ভাঁড়ে চা ঢালবে। যাবতীয় টুকরো কাজ সারবার দায়িত্ব ওই একজনের। একটু ভুল হলেই হাতে-নাতে ধরে ফেলবেন প্রমোটার। খাটুয়ার ব্যাজারমুখে শেষ করে হাসির রেখা ফুটেছিল, বলা মুশকিল।

স্বদেশ ও তিস্তা প্রমোটারের চেম্বারে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা কাটাল। রকমারি কথার ছোটো ছোটো তরঙ্গ। বেশিটাই দড়ি টানাটানি। থাকবে তো আদম ও ইভ। থার্ড ফ্লোরে সাড়ে সাতশো স্কোয়ারফিট। মোর দ্যান এনাফ। কিন্তু দর শুনলে মনে হবে, প্রাণ জুড়িয়ে যাবার পরিবর্তে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে বুঝি। তেপ্পান্ন লক্ষ টাকা! কোথায় পাবে স্বদেশ সমাদ্দার? নিয়োগকর্তার কাছে চাইলেই পাবে। এজিএম বলে কথা! তারপর? তারপর ব্রহ্ম-কমলের পাঁপড়ি ছিড়ে ছিড়ে খাও আর মুচকি-মুচকি হাসি নিয়ে দুনিয়া ছেড়ে পালাও। স্বদেশ যখন সম্মতি দিল, তিস্তা পুলকে ও স্বামী-গৌরবে তখন আরও সুন্দরী, আরও আধুনিকা।

'তুমি পারবে তো এই হাউসিং কমপ্লেক্সে থাকতে?'

—স্বদেশের প্রশ্ন শুনে তিস্ত যেন প্রায় কানে কানে বলে ওঠে, 'তুমি পারলে আমিও পারব। আমাদের সব কিছুই অভেদ। তাছাড়া কী নেই এখানে? সুইমিং পুল, এসি কমিউনিটি হল...'

আপন অনুভবে ও প্রজ্ঞায় এ এক একেবারে আলাদা

তিস্তা। হরেক কিসিমের হয়রানি, হিসেব-নিকেশের গুঁতোগুঁতি, সততাকে বিদায় দেবার বার্তা...সব কিছুই এখন মুছে সাফ। রূপসী প্রৌঢ়ার দিকে চেয়ে সত্যি কি স্বদেশ পারবে নিজের প্রকৃত স্বরূপকে একেবারে বদলে দিতে?

বিরোধের শুরুটা হয়েছিল এইভাবে—

তিস্তা বলল, 'আবার একটা পুজো এসে গেল।'

স্বদেশের মন্তব্য, 'এখনও চার মাস বাকি আছে।'

—তিস্তার কথায় এক হাঁড়ি আবেগ, 'শপিং এখন থেকেই শুরু না করলে পরে খাবি খেতে হবে। যত দিন যাবে, বাজার চড়বে, ভালো কোয়ালিটির মাল উধাও হতে থাকবে।'

তিস্তাকে মনে হচ্ছে তখন যেন উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থনীতিতে তার অবাধ বিচরণ, 'কেবল পেঁয়াজের দিকে আঙুল তোলা কেন? অনেক কিছুতে হাত দিলেই ছ্যাঁকা লাগে। জামাকাপড়ের কী দাম! একটা সাধারণ তাতের শাড়ি...অবাক কাণ্ড!' তিস্তা বরাবরই তেজস্বিনী। পড়াশোনাও অনেকদূর। কিন্তু একবার বলতে শুরু করলে থামতে চায় না। আর বড়ো শপিং শপিং করে। শাড়ির দোকান অথবা জুতোর দোকানে ঢুকলে নীলচে চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। অন্তত এক-দেড়ঘণ্টা পশরাদের নাড়াচাড়া না করে জিনিস কিনবে না।

স্বদেশের মোলায়েম প্রশ্ন 'আমার কী করণীয়?' তিস্তা স্বদেশের মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন এক দুগ্ধপোষ্যকে যত্ন করে সরলতম অঙ্কটি শেখাতে চায়, 'এ মাস থেকে আমার হাতে বাড়তি পাঁচ হাজার টাকা করে দিতে হবে। স্থায়ী দাবি নয়। জাস্ট থ্রি মান্থস। তিন মাসে পনেরো। তারপর পুজোর মাসে আরও পনেরো। হয়ে গেল থার্টি থাউজেন্ড। হয়ে যাবে কমপ্লিট পুজো শপিং। ওকে?' স্বদেশের রা নেই। তবে কপালে ফুটে-ওঠা ভাঁজটা বার্তাবহ। এক সময়ে মিনমিনিয়ে বলে, 'এটা কি সম্ভব?'

প্রত্যুত্তরে তিস্তার অভিপ্রেত ব্যাখ্যাটা আসে, 'তোমার মতো ব্যাঙ্ক আমলারা বোনাস পায় না। তাই তাদের পূজা শপিংটা এভাবেই সারতে হয়।'

তিস্তার এ ধরনের পরামর্শগুলি স্বদেশকে প্রায়শই শুনতে হয়। অনেকগুলিই মেনে নেয়। কিছু উপলব্ধি করলেও বাস্তবায়িত করতে পারে না। বিস্তার উচ্চারণে দৃঢ়সংকল্পের ছোঁওয়া,— যাদের ভিত্তি নিয়ে স্বদেশ তখনই প্রতিবাদী হয় না। প্রারম্ভে নীরবতা; পরে অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্ত্রীকে ধীরে ধীরে নিজের অবস্থাটা বোঝানো। তখন তিস্তার ওই মাসিক দাবি পাঁচ হাজার থেকে কমে হয়তো চার হাজার কিংবা সাড়ে তিন হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। আবার আদপে তা নাও কমতে পারে। বিবাহিত জীবনের প্রথম দুটো বছরে ছিল যেন খাঁ খাঁ রোদ্দুর। স্বপ্নের আনাগোনা, কিন্তু পকেট প্রায় গড়ের মাঠ। এখন তো ওইসব যুক্তি চলবে না। প্রাথমিকভাবে সে যা বোঝাতো, তিস্তা তাতেই মান্যতা দিতো। এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। তাবৎ বিকল্পের সামনে কেবলই রুদ্ধদ্বার। ইতিমধ্যে চাকরিতে চার ধাপ ওপরে উঠেছে স্বদেশ। অভাবজনিত হাহাশ্বাস বৈঠকখানার আড্ডাতেও অচল।

আত্মীয়স্বজন সকলের নজরেই স্বদেশ বড়ো তুখোড়। সাতসকালে উঠে গলা চড়িয়ে পাঠ্য বিষয়গুলি পড়তো। সাংঘাতিক মুখস্তবিদ্যা। শিরা-ধমনীতে ইংরেজি ও বাংলা উভয় অভিধানই গেঁথে আছে। এ ছেলে তো কালে কালে মহীরুহ হবেই। সব বিষয়ে টনটনে হুঁশিয়ার, সম্পন্ন পরিবারের ডাকসাইটে সুন্দরী কন্যা তিস্তারও সেটাই ছিল প্রত্যয়। এখন অবধি সিদ্ধান্ত তার নির্ভুল বলেই মনে হচ্ছে। লোকটার চারিদিকে স্তাবকদের জটলা। অফিস থেকে গাড়ি আসে তুলে নিয়ে যেতে। আর কী চাই? কিন্তু এসবের পাশাপাশি এমন কিছু আছে, যাকে বুঝতে হলে নজরদারিকে গভীরে নামাতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, স্বদেশ মরে গেলেও কোনও পার্টির কাছ থেকে এক নয়াও

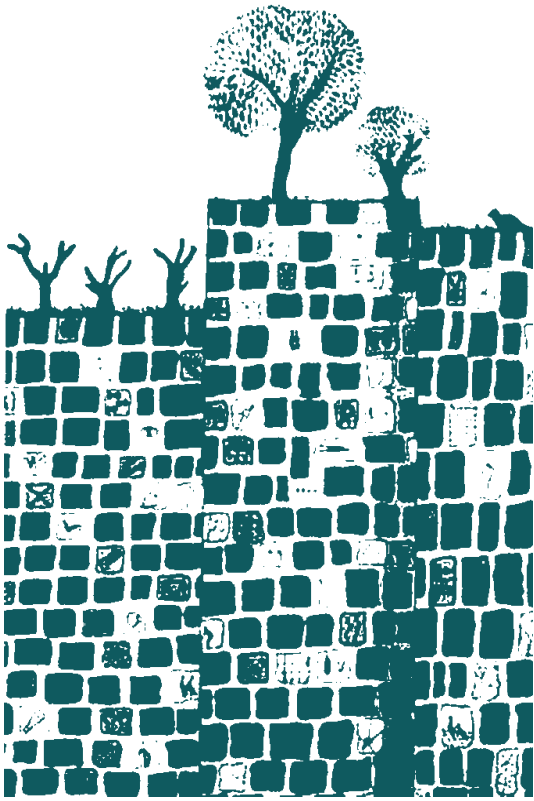

সুবিধা নেবে না। ছিঁচকে নয়, বড়ো পার্টির অফারকেও ফিরিয়ে দিয়েছে কতবার। পাড়ার শাসকদলের মস্তানদের মুখোমুখি হওয়াতে তার কোনও আড়ষ্টতা নেই। ফলে তার দু' কাঁধ জুড়ে হরেক কিসিমের আর্থিক দায় সংখ্যায় ও বহরে ক্রমেই বাড়ছে। যতই পীড়াদায়ক হোক, এদের একটাকেও সে ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলবার কথা ভাবতেও পারে না। বাবা ও মা দু'জনই আশির কোঠা পার করে এখনও বুক ভরে বাতাস টানেন। থাকেন শহর বর্ধমানে দুঁদে ব্যবসায়ী ছোটো ভাইয়ের সংসারে। সেখানে টাকার অভাব নেই। হাঁক পাড়লেই পাঁচটা কর্মচারী এসে দাঁড়াবে। তবুও স্বদেশকে সেখানে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আট হাজার টাকার একখানা অ্যাকাউন্টপেই চেক পাঠাতেই হবে। দেরি হলেই মান খোয়াবার দশা,— মোবাইলে ভেসে আসবে ভাইয়ের হাঁসফাঁস গলা। এ বিষয়ে তিস্তার হস্তক্ষেপ নাস্তি— তোমার বাবা-মা-ভাইয়ের ব্যাপার, সে সব তুমি বুঝবে। আমি কিন্তু সচেতন, সংসারে যেন

ছুঁচোর ডন মারা শুরু না হয়। একমাত্র ছেলে বিবেককে ব্যাঙ্গালোরে তথ্যপ্রযুক্তির কোর্সে ভর্তি করবার সময় কর্মস্থল ব্যাঙ্ক থেকে এডুকেশন লোন নিতে হয়েছে ছয় লক্ষ, যা পরিশোধ করতে তার মাস মাইনে থেকে ব্যাঙ্ক খাবলা মেরে তুলে নেয় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। তদুপরি মন-নিংড়ানো স্নেহের পুত্রকে ফি-মাস পাঠাতে হয় হাজার ছয়েক। নাছোড়বান্দা সন্ত্রস্তভাব,— এই বুঝি দক্ষিণী সংস্থা নতুন কোনও দাবিপত্র পাঠিয়ে বসে। মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা। প্রকাশ্যে নিমরাজির ভান করাও চলে না। প্রতিমাসে অ্যাস্টাব্লিশমেন্ট-সেকশন আয়কর যতটা কাটবার, কাটবেই। তারপরেও উৎকণ্ঠাভরা মার্চ মাস। যদি ট্যাক্স বেশি কাটে, তা ফেরত পেতে কী যে ঝামেলা!

আয়কর একটা বড়ো ধাঁধায় ধোঁয়াশাময়। ইহাও হয়, উহাও হয়। হিসেব কষতে বসলে স্বদেশ বোবা হয়ে যায়। গুরুত্বকে তো পরিসরে ছোটো করা যাবে না। তিস্তার কাছে এ সবই খটকা। প্রযুক্তির কল্যাণে তোমার হিসেব তোমার কাছে। বউকে জড়িও না। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পদস্থ আধিকারিক হয়ে নামি ও বনেদি ক্লাবের মেম্বারশিপ নেবে না, এরকম যদি কেউ ভাবে তাকে অবিলম্বে মনোবিদের চেম্বারে পাঠানো উচিত। কিন্তু সেই ক্লাবে তিস্তার মতো বেটারহাফকে নিয়ে ঘুরতে ফিরতে, উত্তেজক পানীয়তে গলা ভেজাতে, এলাপাথাড়ি নাচতে নাচতে হঠাৎ স্থবির ও নিশ্চুপ হয়ে যেতে কত মাল যে পকেট থেকে বেরিয়ে যায়..., আপনারা কি তার হিসেব রাখেন? রাখেন না। আপনাদের নীরব চাউনিতে সেই এক ধারণা,— এ শালাদের পকেটে সবটাই কালো টাকা। অথচ স্বদেশ ঘোর কালা বিদ্বেষী। ফলে গলায় ফাঁস, ইচ্ছে হয় ল্যাপটপটার ওপর আছড়ে পড়তে; অথবা গেয়ে উঠতে সেই বাউল গান :

এ সংসারে হিসেব যদি করো
বিপদ তোমার ব্রহ্মময়ী, তাঁর চরণে মরো।

সেই মারণ-বাণটা এল তিস্তার কাছ থেকেই। শারীরিক চাহিদা প্রায় নির্বাপিত। বিছানায় শুয়ে দু'জনই অনড়। কোথায় যেন শাঁখ বাজছে। আজও অনেকের বিশ্বাস ও ভক্তি অচলা। তিস্তা স্বদেশের বুকের ওপর হাত রাখে। একান্ত নিবিড়তা। এ প্রেম, এ প্রীতি, এ নির্ভরতা কভু অকিঞ্চন হতে পারে না। স্বদেশ শুনতে পেল তিস্তার আন্তরিক পরামর্শ ও দাবি, 'তুমি তো আর ছয়-সাত বছরের মধ্যে রিটায়ার করবে। এবার একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলো।... রাজারহাট-নিউটাউন। কী উঁচু! হাত বাড়ালেই নীল আকাশ। এখন এটা তোমাকে করতে হবেই।...'

প্রতিটি শব্দ প্রজ্ঞালব্ধ! এক মুঠো বরফের গুঁড়ো স্বদেশের বুকের ফাঁকা অংশটা ভরাট করে দিচ্ছে। তিস্তার কথা আর শেষ হতে চায় না। '...তোমার ব্যাঙ্কই তো লোন দেবে তোমাকে। একেবারে মজবুত শেডের তোলায় দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমাকে নিয়ে।... ব্যাঙ্কে পেনশানটা তেমন ভালো নয়, শুনেছি। তা হোক, ছেলে দাঁড়িয়ে যাবে।... রাজারহাট-নিউটাউন।... প্রত্যেকটি ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হয় মুখ্যমন্ত্রী, নয়তো তাঁর ভাইপোর ছবি। ...সবাই কুশলে আছে। সবার হাতে সুখের চাবি। সুখ ও কাল দুইই নিরবধি।...'

তিস্তা যেন ঝোড়ো আবেগে একটি আধুনিক কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে স্বদেশকে।

* * *

প্রমোটারের সঙ্গে কথাবার্তা ফাইনাল। ব্যাঙ্ক ঋণ দেবে। স্বদেশ তিস্তার কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'বাড়িটার যত দাম, ব্যাঙ্ক তার একটা ইন্সুরেন্স করিয়ে নেবে আমাকে দিয়ে। অর্থাৎ ওই ফ্ল্যাটে ঢুকে আমি যদি মারাও যাই, কোনও ক্ষতি হবে না। নমিনি হিসেবে পুরো টাকাটা পাবে ব্যাঙ্ক। আর সেই সঙ্গে ফ্ল্যাটটার সম্পূর্ণ মালিকানাও গিয়ে বর্তাবে শ্রীযুক্তা তিস্তা দেবীর হাতে।...'

'মানে?'

—তিস্তার আর্তনাদে বোগেনভিলিয়াগুলিও কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে আসে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

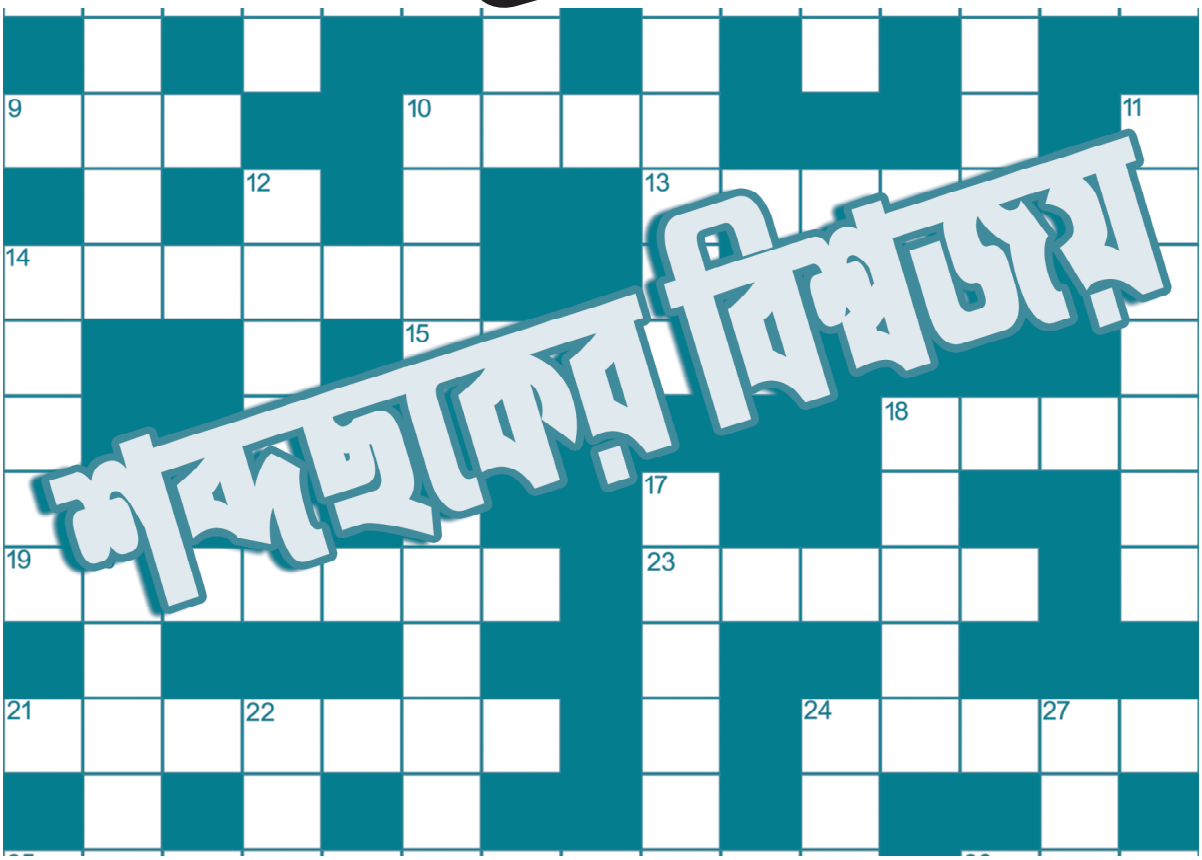

পার্থসারথি গুহ

ক্রস পাজল বা শব্দছক তৈরিতে অর্কদ্যুতি সোমের জুড়ি মেলা ভার। শুধু শব্দছকই নয়, সুডোকুও সে করছে এন্তার। কলকাতার প্রায় সব প্রভাতি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক সবেতেই অর্কর শব্দছক যায় পালা করে। স্বাধীনচেতা অর্ক ইচ্ছা করলে কলকাতার প্রথম সারির কাগজে মাস মাহিনার মোটা বেতনের চাকরি করতে পারত। নানা হাউসে ঘুরে ঘুরে নিয়মিত শব্দছক দেওয়া বা মাস ফুরোলে চেক নিতে যাওয়ার ধকল হতো না তাতে। এক জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে রাজার হালে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু এই এক জায়গায় কাজ করাটাই কিছুতেই পোশায় না তার। সে দেশের বা রাজ্যের তাবড় পত্রিকা হাউস হোক আর যেই হোক। আসলে কারো কাছে নিজের সৃজনশীলতাকে বন্ধক রাখার বান্দা নয় অর্ক। এই যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার অফিসে সে যায় এটা যেন তার জীবনের প্রাণভোমরা। সব অফিসেই তার প্রচুর বন্ধুবান্ধব, সিনিয়র দাদা-দিদিরা রয়েছেন। যাদের সঙ্গে মাস গেলে একবার অন্তত দেখা না হলে মনটা ভারী আনচান করতে থাকে। এদের অনেকের কাছেই তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। নানা ভাবে এরা তাকে উৎসাহ জুগিয়ে থাকেন। যখন একেবারেই নবীশ তখন থেকেই এদের বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্যের হাত আজ তাকে এই জায়গায় আসতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। বলা ভালো এইসব মানুষগুলোর টানেই সে এই একাধিক হাউসে ঘুরে কাজ করতে ভালোবাসে। তা বলে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে সব জায়গাতেই যে অভিজ্ঞতা খুব সুখের তা কিন্তু নয়। বেশ কয়েকটি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কাগজে টাকা পেতে কালঘামও ছুটেছে ওর। অনেকে তো স্রেফ মেরেই দিয়েছে ওর ন্যায্য পাওনা। তাও হাসিমুখে লড়াইয়ের ময়দানে থেকে গিয়েছে সে। তাছাড়া কেউ তার কাজের ওপর খবরদারি করবে এটাও না পসন্দ অর্কের। তা বলে বাঘা বাঘা পত্রিকা সম্পাদক বা বিভাগীয় প্রধানদের অমান্য করে সে, এমনটা কিন্তু নয় মোটেই। বরং এই নামিদামি মানুষগুলির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বর্তেই যায় সে। রোজ কত কি-না শেখা যায় এইসব পণ্ডিত মানুষদের থেকে। অনেক সময় এমন হয় সেইসব বিভাগীয় প্রধানরা অর্ককে কোনও একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে শব্দছক তৈরি করতে হবে। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে যেমন পুজোকে কেন্দ্র করে শব্দছকের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করতে হয়। এভাবেই বাংলা নববর্ষ, ফুটবল বিশ্বকাপ, ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলের জন্মদিবস, নেতাজী সুভাষ, স্বাধীনতা দিবস, কালীপুজো ইত্যাদি নানা বিষয় জায়গা করে নেয় তার শব্দছকের বুনন জালে।

ইদ, বড়োদিন, বসন্তোৎসবও ঠাঁই পায় তার শব্দছকের অঙ্গনে। বীর সাভারকার, শ্যামাপ্রসাদ, দীনদয়াল উপাধ্যায়, মার্কস-লেনিন, হো-চি-মিন থেকে গান্ধী-নেহরুর ওপরেও কাজ করতে হয় তাকে। এজন্য মাঝেমধ্যেই দৈনিক কাগজের ডাকাবুকো সাংবাদিক অজয়দা অর্ককে অলরাউন্ডার বলে ডেকে থাকেন।

অর্কর এই শব্দছকের দুনিয়ায় মেতে ওঠার গল্পটাও ভারী অদ্ভুত। প্রথমদিকে, বাংলায় কেমন যেন আড়ষ্টই ছিল সে। তুলনায়

ইংরেজিতে তার আগ্রহ ছিল বেশি। সেই ছেলেই কিনা মাধ্যমিক দেওয়ার পর বেমালুম পালটে গেল একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বাড়িতে বাংলা কাগজ আসত অন্তত ৩-৪ রকমের। পেশায় শিক্ষক বাবা সারাদিন ছেলেপুলেদের পড়ানোর পর যেটুকু অবসর পেতেন তা কাগজ আর বইপত্র নিয়ে কাটাতেন। সংসারের বিষয় নিয়ে যা যদিও বা কথা বলতে যেত, কিন্তু হু-হাঁ ছাড়া উত্তর মিলত না। অর্ক নিজেও বাবার থেকে বরাবরই একটা দূরত্ব রাখত ভয়জনিত কারণে। তার যাবতীয় আবদার ছিল মায়ের কাছে। সেদিন সন্ধ্যায় পড়াশুনার তেমন চাপ না থাকায় কী মনে করে সংবাদপত্রগুলো উলটে পালটে দেখছিল সে। বাবা মনে হয় বাথরুমে ছিলেন। রোজকার অভ্যেসমতো গা-হাত-পা ধুচ্ছিলেন। একটা খবরের কাগজ তুলে এ পাতা ওপাতা করতে করতে অর্কর হঠাৎ চোখ আটকে যায় শব্দছকের জায়গায়। বাবা প্রায় অর্ধেকের বেশি মিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। কী মনে করে খালি ঘরগুলো মেলাতে শুরুও করে দেয় সে। যে কিনা কোনওদিন শব্দছকের ধার ধারত না, সেই অর্ক পটাপট মিলিয়ে দিয়ে ফাঁকা ঘরগুলো ভরিয়ে দেয়। এদিকে বাবা যে কখন ঘরে ফিরে এসে ছেলের কর্মকাণ্ড দেখছেন, তা টেরও পায়নি সে। সম্বিৎ ফেরে বাবার চিৎকারে, আরে রেবা দেখে যাও তোমার ছেলের কাণ্ড। যেন সে যুদ্ধজয় করেছে এমন ভঙ্গিতে বাবা স্বগতোক্তি করে ওঠেন, কে বলে তুই বাংলায় কাঁচা। যে শব্দগুলো আমিও মেলাতে পারিনি সেটাও কেমন অনায়াসে করে দিলি। ব্র্যাভো মাই বয়, ব্র্যাভো। মা-বাবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখ দেখে সেদিনই শব্দছকের ঘরগুলোর মধ্যে মিশে গিয়েছিল অর্কর যাবতীয় ভাবাবেগ।

শব্দছক করতে করতে বলতে বলতে কখন নিজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা বুঝতেই পারেনি সে। চ্যানেল এক্সের রণিতদার করা ওকে নিয়ে নিউজটাই কেল্লা ফতে করে দিয়েছে। তাতে অর্কর বাইট সংবলিত কাজের, অধ্যবসায়ের যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে তা একেবারে যাকে বলে সুপারহিট। এটা তো অস্বীকার করা যাবে না, এখন ইলেকট্রনিক আর ডিজিটালের বাজার। এসব চ্যানেল ও পোর্টালের দর্শক সংখ্যাও প্রচুর।

এই নিউজটা যেদিন সম্প্রচার হয়, আর তার পরে বেশ কয়েকবার তার রিপিট টেলিকাস্টও হয়। তারপর থেকে নিজের পাড়াতেই কেমন যেন ভাও বেড়ে গিয়েছে তার। এমনিতেই ছোটো থেকে খুব একটা কারও সঙ্গে মিশতে পারত না। পাড়ায় বন্ধু নেই বললেই চলে। স্কুলে, কলেজেও হাতে গোনা কয়েকজনই তার বন্ধু হয়ে উঠেছে। যাদের সঙ্গে এখনও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলে সে।

অথচ চ্যানেল এক্সে তার খবরটা টেলিকাস্ট হওয়ার পর থেকেই তাকে নিয়ে মাতামাতি যাকে বলে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটা যে খুব একটা খারাপ লাগে তা নয়। অর্ক বেশ উপভোগই করে মানুষের এই পালটে যাওয়া আচার আচরণ দেখে।

কদিন আগেই পাড়ার চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে আপন মনে অর্ক হেঁটে যাচ্ছিল সামনের দোকানের দিকে। আসলে সেদিন সকালের দিকটা একটু কাজ হালকা থাকায় নিজেই মায়ের থেকে লিস্ট লিখে মাসকাবারি টুকটাক দু-একটা জিনিস কিনতে যাচ্ছিল মোড়ের মাথার বড়ো দোকানটায়। এর মধ্যে হঠাৎই চায়ের দোকানের গজুদা তাকে একরকম পাকড়াও করে নিয়ে বসালেন দোকানের ভিতরের সব থেকে গ্ল্যামারাস আসনে।

অর্ক যতই বলে সে চা খেয়েই বেরিয়েছে গজুদা নাছোড়বান্দা। এক কাপ স্পেশ্যাল চা না খাইয়ে তাকে ছাড়বেই না। আর শুধুই কী গজুদা, দোকানের ভিতর ঢুকে অর্কর তো যাকে বলে চক্ষু চড়কগাছ। পাড়ার বড়ো, মেজো, ছোটো সব মাতব্বররাই কার্যত হাজির সেখানে। বলাবাহুল্য গজুদার দোকানটাও নেহাত ছোটো নয়। কিন্তু তাকেও যেন ছাপিয়ে গিয়েছে সেদিনের উপস্থিতি। বয়োজ্যেষ্ঠ অনুকূলবাবু যেমন সেখানে উপস্থিত তেমনই রয়েছেন পাড়ার হোমরাচোমড়া পার্টি করা মাতব্বর তন্ময়বাবু, স্থানীয় ক্লাবের ডাকসাইটে সেক্রেটারি তপনবাবু-সহ আরও অনেকে। পাড়ার রক কাঁপানো বাচ্চুদাও যথারীতি ফুল টিম নিয়ে মোতায়েন হয়েছেন গজুদার দোকানে।

আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু অর্ককে নিয়ে যাকে বলে হামলে পড়েছেন এই হরেক বয়সের মানুষগুলি। দুদিন আগেও তাকে যারা প্রায়ই পুঁছতই না, সেই সিনিয়রদের এরকম আগ্রহ দেখে বেশ চনমনেই লাগছিল তার।

এরপরের কথোপকথনে তাকে ঘিরে যে বিশাল পরিমাণ আগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল তা সত্যি ভারী অবাক করেছিল অর্কদ্যুতিকে। এতদিন ধরেই তো সে একটানা শব্দছক আর সুডোকু করে যাচ্ছে নানা পত্রপত্রিকায়। কই কেউ তো তেমন আগ্রহ দেখায়নি তাকে নিয়ে। অথচ চ্যানেল এক্সের একটা ইন্টারভিউ রাতারাতি তাকে এতটাই জনপ্রিয় করে তুলল যে কল্পনাতীত।

সেদিনের সংলাপগুলোতে ঝরে ঝরে পড়ছিল প্রশস্তির মণ্ডা-মিঠাই। বরাবরের মতো নেতাগিরি দেখিয়ে এর শুরুটা করেছিলেন তন্ময়বাবুই। বলে উঠেছিলেন, আরে অর্ক তুমি তো এখন আমাদের পাড়ার গর্ব হে! সেদিন চ্যানেল এক্সে তোমায় দেখে আমরা যাকে বলে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। তা বুঝলে বাবা, সামনের ভোটে তোমায় কিন্তু আমাদের মঞ্চে মাঝে মধ্যে হাজির হতে হবে, এই এখন থেকেই বলে দিলাম। এই আব্দারটুকু রাখতে হবে কিন্তু। অনুরোধের আড়ালে তন্ময়বাবুর প্রায় আদেশের সুর মোটেই ভালো লাগেনি অর্কর। রাজনীতির পঙ্কিল ময়দান থেকে সে বরাবর দূরত্ব রেখে চলতে ভালোবাসে। তার চোখে রাজনীতিবিদদের চেহারা খুব সুবিধের নয়। তাও ভদ্রতার খাতিরে মুখে একটা হাসি ঝুলিয়ে অর্কদ্যুতি তন্ময়বাবুকে এটুকুই বলেছিল, সময় তো পাই না মোটেই, সুযোগ পেলে দেখা যাবে। এরপরের তন্ময়বাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে প্রায় থামিয়ে ক্রিজে নেমে পড়েন বয়োবৃদ্ধ অনুকূলবাবু। তিনি তন্ময়কে একরকম দাবড়ে বলে ওঠেন, আরে ছাড়ো তো তোমাদের সবেতেই রাজনীতির ফায়দা খোঁজা। জীবনটাকে একটু সোজাভাবে দেখতে শেখো তন্ময়। ছেলেটো এত ভালো কাজ করছে, শব্দছকের মতো জটিল জিনিসকে জলবৎ তরলং করে সাধারণের হাতে হাতে তুলে দিচ্ছে, এর কৃতিত্ব কম নাকি। অনুকূলবাবুর সঙ্গে একমত হয়ে তপনদা, বাচ্চুদা আর সমবেত ইয়ং ব্রিগেড কোরাস করে উঠেছিল, একদম, একদম, তার চেয়ে আমাদের পাড়ার গর্ব অর্ককে একটা সংবর্ধনা

দেওয়া হোক আগে। স্মিত হেসে পাড়ার মানুষের তার প্রতি ভালোবাসাকে সম্মান জানিয়ে অর্কদ্যুতি খালি এটাই বলেছিল, ''দাঁড়ান এখনও অনেক পথ চলা বাকি।''

শব্দছক করেও যে তারকা হওয়া যায় তার একটা আভাস মিলেছিল পুজোর আগের এক ফ্যাশন শোতে। নিউজপ্রিন্টে খোদাই হওয়া অর্কর সাধের শব্দছক তখন কেতাদুরস্ত শাড়ির পাড়ে, আঁচলে ফুটে উঠেছে বনানীদির অসীম আগ্রহে। গত দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণও হয়ে উঠেছিল শাড়িতে শব্দছক। সপরিবারে পাড়ার মণ্ডপে অঞ্জলি দিতে এসে অর্ক চোখের সামনে দেখেছিল শব্দছকের আঁকিবুকিতে সজ্জিত শাড়ি-কুর্তি পরা আধুনিক মেয়েদের। আর এই পুজোর সময়ই কলকাতার এক নামি থিম মেকারের ফোন পেয়ে সে রীতিমতো 'চমকে চ' হয়েছিল। সেই থিম আর্টিস্ট প্রাণতোষ সাফ বলেছিল, অর্কদ্যুতি আপনার কাজের খবরটা আমি দেরিতে পেলাম। সামনের বছর কলকাতার এক নামি পুজো শব্দছকের থিমের ওপর গড়ে তুলতে চাই। আর এই ব্যাপারে মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে আমার কথাও ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। টাকার ব্যাপারে ওরা কোনও কার্পণ্য করবে না। আপনার কাছে শুধু একটাই অনুরোধ দয়া করে আর কারো প্রস্তাবে রাজি হবেন না। বোঝেন তো চারদিকে রাইভ্যাল প্রচুর। আমি পুজোর পরেই আপনার সঙ্গে বসছি। এই ফোনটা পাওয়ার পর অর্কদ্যুতি বুঝেছিল তার স্বপ্নের ট্রেন এখন দুরন্ত এক্সপ্রেস গতিতে ছুটছে। সেদিন বেশি দূরে নেই যেদিন এই স্বপ্নকে ছুঁতে পারবে সে।

অর্কদ্যুতির জীবনের সেরা দিন আজ। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই সে ইমেল পেয়েছে দুনিয়ার তামাম রেকর্ডসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে। গিনেস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শব্দছকের সংখ্যা ও হরেক বিষয়ের উপস্থিতির জন্য তাকে এই বিভাগের সেরা মনোনীত করা হয়েছে সারা দুনিয়ার মধ্যে থেকে। বছরখানেক আগে অবশ্য ভারত সেরার শিরোপা তার ঝুলিতে এসেছিল ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসের হাত ধরে। কিন্তু দুধের স্বাদ তো আর ঘোলে মেটে না। দেশের সেরা ঠিক আছে, সারা বিশ্বের মধ্যে তার নাম ছড়িয়ে পড়ুক এই স্বপ্নতেই তখন বুঁদ সে। এর মধ্যেই তার কাজের স্বীকৃতি দিয়ে গিনেস রেকর্ডসের এই ই-মেল প্রাপ্তি। বস্তুত, জীবনটাই যে তার পালটে যেতে বসেছে একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হতে হতেও অর্কদ্যুতি তা ধরতে পারছিল। সে নিজে ও তার হাতে লালিত পালিত হওয়া রাশি রাশি শব্দছক আজ আন্তর্জাতিক হয়ে উঠল। ▮

চিরসখা হে

সন্দীপ চক্রবর্তী

সুতপা এখনও বারান্দায়। শীতের রোদ্দুর বারান্দা থেকে নেমে অনেকক্ষণ দূরে সরে গেছে। উত্তুরে হাওয়ায় জড়োসড়ো হয়ে বসে ও কিছু ভাবছে।

ভাবছে বুবিনের কথা। চার বছর বয়েস হয়ে গেল বুবিনের। অথচ এখনও কথা বলতে শিখল না। এমনকী মা বলতেও নয়। আগে কানেও সমস্যা ছিল। এখন শুনতে পায়। নানারকম আওয়াজ আর ইশারা করে বুবিন বোঝায় ওর খিদে পেয়েছে। কিংবা ওর ছবি আঁকতে ভালো লাগছে না। কোনও কথা বোঝাতে না পারলে বুবিন বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সহ্য করতে পারে না সুতপা। কান্না পায় ওর। বুবিনের চোখের আড়ালে গিয়ে ও তখন চুপ করে বসে থাকে।

কৃষ্ণেন্দু সুতপার মতো নয়। গৌতম সেনের ওপর ওর অগাধ আস্থা। সুতপা কান্নাকাটি করলে ও বলে, কেন নিজেকে মিছিমিছি কষ্ট দাও? আজকাল বুবিন কত তাড়াতাড়ি রি-অ্যাক্ট করে দেখেছ? ডক্টর সেন তো সেটাই বলেছিলেন। রি-অ্যাক্ট করতে পারলেই বুবিন কথা বলতে শিখে যাবে।

গৌতম সেন বিখ্যাত স্পিচ থেরাপিস্ট। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও স্পিচ ডিসঅর্ডারের বহু রোগী ওর কাছে আসে। ওর যোগ্যতা নিয়ে সুতপার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও প্রত্যেকবার বুবিনের চেক আপের সময় সুতপা জিজ্ঞাসা করে, বুবিন কথা বলতে পারবে তো ডাক্তারবাবু? গৌতম সেন বলেন, আর একটু ধৈর্য ধরুন। বুবিন একদম গড়গড় করে কথা বলবে। বাড়ি ফিরে সুতপা অনেক আশা নিয়ে ছেলেকে বলে, মা বল বুবিন— মা! বুবিন হাঁ করে। দুর্বোধ্য কিছু আওয়াজ বেরিয়ে আসে ওর গলা দিয়ে। কিন্তু সেই আওয়াজের ভিড়ে মা ডাক আছে কিনা সুতপা বুঝতে পারে না।

পাখিদের ডাকাডাকিতে সুতপার সম্বিত ফিরল। মাথার ওপর ছায়া-ছায়া আকাশ। শীত যেন জাঁকিয়ে পড়েছে।

উঠে পড়ল সুতপা। বারন্দার লাগোয়া ঘরটা ওদের শোবার ঘর। আজ রবিবার। কৃষ্ণেন্দু আর বুবিন খাটে ঘুমোচ্ছে। ছুটির দিন মানেই কৃষ্ণেন্দুর দিবানিদ্রা। বাবার দেখাদেখি বুবিনেরও অভ্যেস হয়ে গেছে।

অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে আজ। সুতপা কিচেনে ঢুকল। এখন ওর প্রথম কাজ বুবিনের খাবার তৈরি করা। তারপর চা। ঘুম থেকে উঠেই কৃষ্ণেন্দু চা-চা করে অস্থির করে তুলবে।

সংসারের এই ব্যস্ততা সুতপার ভালো লাগে। একটা পরিপূর্ণতার অনুভূতি হয়। বিয়ের পর মেয়েরা যা চায় ও তার সবই পেয়েছে। শুধু যদি বুবিনটা কথা বলতে পারত—

নুডলস দেখে বুবিন খুব খুশি। নুডলস ওর সব থেকে প্রিয়। অন্য কিছু দিলে ঠোঁট সরু করে সশব্দে হাওয়া টেনে বোঝায় ওর নুডলস চাই। সুতপার হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে ও পাশের ঘরে চলে গেল। খেতে খেতে কার্টুন চ্যানেল দেখবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

কী কথা!

তুমি আবার গান গাওয়া শুরু করো সুতপা। কাল একটা সাইটে দেখছিলাম যে-সব বাচ্চার স্পিচ ডিসঅর্ডার আছে গান শুনলে ওদের কথা বলার ইচ্ছে আরও বেড়ে যায়।

সুতপা হাসল, আমি জানি তুমি গান শুনতে ভালোবাসো। তাই বুঝি বুবিনের দোহাই দিয়ে গান গাইতে বলছ?

কৃষ্ণেন্দু সুতপাকে চেনে। প্রচলিত নিয়মের বাইরে কোনও কিছু ওকে বিশ্বাস করাতে হলে প্রমাণ চাই। ও ল্যাপটপ খুলে একটা বিশেষ সাইট ডাউনলোড করল। তারপর ল্যাপটপটা সুতপার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, এই লেখাটা পড়ো। তা হলেই সব বুঝতে পারবে।

পড়ার পর সুতপা ভুরু কুঁচকে বলল, ডক্টর সেন তো এসব কথা কখনও বলেননি!

ডক্টর সেন ট্র্যাডিশনাল মেথডের ডাক্তার। অলটারনেটিভ মেথডের কথা নাও বলতে পারেন। তবে যদি এরপরেও কোনো সন্দেহ থাকে তুমি না হয় ওকেই একবার জিজ্ঞাসা করে নিয়ো।

এই জন্যেই কৃষ্ণেন্দুকে সুতপার এত ভালো লাগে। কখনও নিজের মত জোর করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয় না। কিন্তু ওই সাইটে যা লেখা আছে তা কি ঠিক? গান শুনলে বুবিন সত্যি

ভালো হয়ে যাবে?

সুতপার আকুতিভরা দৃষ্টি এক দুর্নিবার আকর্ষণে খাটের পিছনদিকের দেওয়ালের ওপর আছড়ে পড়ল। ওখানে ওর তানপুরাটা ঝুলছে। এককালের প্রিয় সঙ্গী দু'বছরে অনেকটাই দূরে সরে গেছে।

কৃষ্ণেন্দু বলল, বুবিনের প্রবলেমটা জানার পর থেকে তুমি আর গান গাও না। কিছু বললে বলো ইচ্ছে করে না। তোমার গান শুনলে বুবিন যদি কথা বলতে পারে তা হলেও কি তুমি গাইবে না?

সুতপা কোনও উত্তর না দিয়ে এঁটো কাপদুটো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এখন ওর একটু ভাবার পরিসর চাই। কৃষ্ণেন্দুর চাওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে কোনো ভুল নেই। অন্য কেউ হলে সানন্দে মেনে নিত। কিন্তু সুতপা অন্যদের মতো নয়। গান ওর আনন্দ। ওর মুক্তি। সুর একবার ওর নাগাল পেলে সংসারের সব বন্ধন শুকনো পাতার মতো খসে পড়ে। তখন ও কারও স্ত্রী নয়, কারও মা নয়। তখন ও অনন্তের সাধক।

এই ভাবনাটাই বড়ো গোলমেলে। গান কি আর কেউ গায় না? সুতপা জানে গায়। আবার দিব্যি সংসারও করে। কিন্তু সুতপা পারে না। পারে না বলেই ও বুবিনের কথা ভেবে গান ছেড়ে দিয়েছিল।

ওর মনে হয়েছিল গান গাওয়ার থেকে বুবিনের কথা বলতে পারা বেশি জরুরি। এখন থেকে ও নিজের ভালোলাগার কথা আর ভাববে না। সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে ও শুধু বুবিনের জন্য কথা খুঁজবে।

কিন্তু এখন সুতপার মনে হচ্ছে সর্বস্ব উজাড় করে দিতে ও পারেনি। ওয়েবসাইটের লেখাটা পড়ার পর থেকে ও তীব্র এক টানাপড়েনে আক্রান্ত। কে যেন ওর বুকের ভেতর থেকে ক্রমাগত বলে চলেছে, বুবিনের জন্য গান ছেড়ে তুমি সুখী হওনি সুতপা। সারাদিনে অজস্রবার তুমি সবার অলক্ষ্যে কাঙালের মতো তানপুরাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। বাথরুমে শাওয়ারের নীচে তুমি কাঁদতে। যে ত্যাগে মনের সায় নেই সেটা আত্মপ্রতারণা। দু'বছর ধরে তুমি তাই করেছ। অবান্তর জেদ ছাড়ো। কৃষ্ণেন্দু যা বলছে মেনে নাও।

মাঝরাতে বারান্দায় একলা দাঁড়িয়ে সুতপা তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। বাবার কথা মনে পড়ছিল ওর। পরিমলের ইচ্ছাতেই সুতপার গান শেখা। সাধারণ শেখা নয় রীতিমতো ওস্তাদ গাইয়ের কাছে নাড়া বেঁধে শেখা। শুধুমাত্র গানের জন্য দিদির থেকে ও বেশি স্নেহ পেয়েছে বাবার কাছে। পরিমল বলতেন, একটা কথা সবসময় মনে রাখবি তপা। একজন দুঃখী মানুষ কখনও কাউকে আনন্দ দিতে পারে না। তাই গান কখনও ছাড়বি না। গান তোকে যে আনন্দ দেবে তুই সেই আনন্দ সংসারে বিলিয়ে দিবি।

ডক্টর গৌতম সেন মাসে একবার বুবিনকে দেখেন। এ মাসের ডেট আজ। কৃষ্ণেন্দুর অফিসে জরুরি মিটিং আছে। সুতপা নিয়ে যাবে বুবিনকে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট চারটের সময়। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সুতপা ল্যান্সডাউন রোডের চেম্বারে পৌঁছে গেল। ডক্টর সেন সময়ের ব্যাপারে খুব কড়া। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

আধ ঘণ্টা ধরে বুবিনকে নানাভাবে পরীক্ষা করে ডক্টর সেন বললেন, ছেলের প্রোগেস তো বেশ ভালো। বোধহয় আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

আজ সুতপা আগমার্কা প্রশ্নটা করল না। হেসে বলল, আমার হাজব্যান্ড বলছিলেন গান শুনলে নাকি এই ধরনের পেশেন্টদের কথা বলার ইচ্ছে আরও জোরালো হয়। কথাটা কি সত্যি ডক্টর সেন?

অফ কোর্স সত্যি! বিদেশে এই নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে লাউড মিউজিক নয়, হালকা কিছু।

বন্দি পাখি দৈবাৎ খাঁচার দরজা খোলা পেলে যে-তীব্রতায় আকাশের দিকে উড়ে যায়

ঠিক সেইভাবে সুতপা বাড়ি ফিরল। যেটুকু বাধা ছিল তাও সরে গেছে। ওর অন্তর্লীন দুই সত্তা এক হয়ে গেছে। দীর্ঘ দ্বৈরথের পর মা আর শিল্পী একে অপরের পরিপূরক হতে পেরেছে শুধুমাত্র বুবিনের জন্য।

পরের দিনই ঢাকনা থেকে বেরিয়ে সুতপার চেনা স্পর্শ পেয়ে ঝংকার তুলল তানপুরা।

বুবিন বেশ অবাক। কিম্ভুতকিমাকার জিনিসটাকে ও আজন্ম দেওয়ালে ঝুলতেই দেখেছে। সেটা যে কোনওদিন দেওয়াল থেকে নামতে পারে এবং এমনি করে বাজতে পারে ও বোধহয় আশা করেনি।

ছেলের বিস্ময়ে অভিভূত সুতপা বলল, আমি গান গাইব বুবিন। দেখবি, তোর খুব ভালে লাগবে।

বুবিন প্রতিক্রিয়াহীন। গান ও শুনে থাকলেও তাকে যে গান বলে এই বোধ ওর ছিল না। নতুন কিছু একটা ঘটবে শুধু এই প্রত্যাশায় ও চেয়ে রইল মায়ের মুখের দিকে।

তানপুরা সুরে বাঁধতে বাঁধতে চিন্তা করছিল সুতপা। কী গান গাইবে ও? ক্লাসিক্যাল নাকি রবীন্দ্রনাথ? অনেক ভাবনাচিন্তার পর সুতপা রবীন্দ্রনাথের গান গাইল, সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে—

সুতপা উঁচুমাপের গায়িকা। গাওয়ার গুণে ওর মনের আশ্রয়ে সুখী বনের হরিণ ঘরের বাতাসে মূর্ত হয়ে উঠল। হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যায়। আদর করা যায়।

গান শেষ করে চোখ খুলল সুতপা। দেখল বুবিন পলকহীন চোখে তানপুরাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেন তানপুরাটাই পৃথিবীর সব থেকে বড়ো বিস্ময়।

কথাটা মিথ্যে নয়। কথা বলতে পারে না বলে শব্দময় জগতের প্রতি বুবিনের তীব্র আকর্ষণ। বারান্দায় শালিখ ডাকলে ও দৌড়ে যায়। চড়ুইপাখিরা কিচিরমিচির করলে কান খাড়া করে শোনে। সুতপার গানের কথা বা সুর ও বোঝেনি। কিন্তু তানপুরার ছোটো ছোটো ঝংকার ওর মনকে বশ করে ফেলেছে।

সুতপা অবশ্য এসব বুঝল না। ওর মনে হলো বুবিনের তানপুরার দিকে তাকিয়ে থাকা মানে গান শুনে ভালো লেগেছে। উৎসাহিত হয়ে ও আর একটা গান গাইল, শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকীর ওই ডালে ডালে—

আশ্চর্য! এবারও একই দৃশ্য। বুবিনের চোখ তানপুরার ওপর স্থির। সুতপা খুশিতে পাগল। ভাগ্যিস সাইটটা কৃষ্ণেন্দুর চোখে পড়েছিল। নয়তো এত সহজ একটা রাস্তার কথা জানাই যেত না।

রাতে কৃষ্ণেন্দু বাড়ি ফেরা মাত্র রিপোর্টিং করল সুতপা। এই সময়টায় কৃষ্ণেন্দু ছেলের সঙ্গে খেলে। ওর সঙ্গে অনর্গল কথা বলে। এটা গৌতম সেনের চিকিৎসারই একটা অঙ্গ। বুবিনের সঙ্গে কথা না বললে ওর কথা বলার ইচ্ছে হবে না। খেলতে খেলতে কৃষ্ণেন্দু বলল, তোমাকে কিন্তু লেগে থাকতে হবে সুতপা। চট করে কোনো রেজাল্ট আশা করো না।

সুতপা নির্বোধ নয়। ও জানে সময় লাগবে। তবে তারও একটা সীমা আছে। বেশি দেরি হবে না। হতে পারে না। বুবিনের রক্তে রয়েছে গান। গান শুনে সাড়া ও দেবেই।

প্রবল উদ্যোমে কাজ শুরু করে দিল সুতপা। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে ওর অপেক্ষা শুরু হয়। কখন বিকেল হবে। বিকেল হলেই ও তানপুরা নিয়ে বসে। তারপর শুরু হয় গান। দিনের পর দিন এইভাবে চলতে থাকে। সুতপার প্রত্যাশার তীব্রতা ক্রমশ বেড়ে চলে। নিজের ওপর ওর অগাধ আস্থা। ও জানে বুবিন খুব শীঘ্রই কথা বলবে। ওর গান বুবিনকে অনাবিষ্কৃত কথার ভাণ্ডারের সন্ধান দেবে। হিসেবে এ যে ওর কত বড়ো পাওয়া তা বলে বোঝানো অসম্ভব।

ওদিকে বুবিনও অপেক্ষা করে বিকেলের জন্য। তানপুরাটার সঙ্গে ওর বেশ ভাব হয়ে গেছে। আজকাল তানপুরার সুর শুনতে শুনতে প্রায়শই ওর ঘুম পেয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে ও তানপুরা নিয়ে কার্টুনের দুনিয়ায় ঢুকে পড়ে। চারিদিকে আঁকাবাঁকা পাহাড়। নদী আকাশ। হাতি গণ্ডার বাঘ সিংহ। দু' একটা আত্মভোলা মানুষ। ওদের কেউ কথা বলতে পারে না। সেই নিঃশব্দ পৃথিবীতে ওরা সবাই বুবিনের বাজনা শুনতে আসে। বাজনা শুনে ওরা অবাক হয়ে যায়। আশ্চর্য এক আনন্দের স্পর্শে ওদের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে।

দিন কেটে যায়। দেখতে দেখতে প্রায় দু'মাস কেটে গেল। কিন্তু বুবিনের কোনও উন্নতি হলো না। সুতপার উৎসাহে এখন কিছুটা ভাটার টান। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ও অনেক কিছু আশা করে ফেলেছিল। তার কিছুই মেটেনি। সামান্যতম পরিবর্তনও দেখা যায়নি। ইদানীং ওর ধারণা হয়েছে, এভাবে কিছু হবে না। ডক্টর সেন সম্ভবত বুবিনের সমস্যাটা ঠিকমতো বুঝতে পারেননি। অন্য কারও সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। কৃষ্ণেন্দু বোঝায়। সুতপার সংশয় দূর করার চেষ্টা করে। সুতপা শোনে কৃষ্ণেন্দুর কথা। কিন্তু ভরসা করতে পারে না। ওর মনে হয় বুবিন একদিন অপার নৈঃশব্দের মধ্যে হারিয়ে যাবে।

যদিও সুতপা গান এখনও বন্ধ করেনি। বিকেল হলে তানপুরাটা দেওয়াল থেকে নামায়। কিন্তু বেশিরভাগ দিনই বুবিন ঘুমিয়ে পড়ে। অসহ্য টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত সুতপা ভাবতে পারে না ওর সুরের মায়ায় বুবিন ঘুমিয়ে পড়েছে। কৃষ্ণেন্দু বোঝালেও পারে না। নিজের ব্যর্থতাই ওর কাছে বড়ো হয়ে ওঠে। যেন বুবিনের কথা বলতে না পারার জন্য ও দায়ী। ওরই কোনো পাপে কষ্ট পাচ্ছে বুবিন।

রবিবার দুপুরে বারান্দায় বসে সুতপা এইসব কথাই ভাবছিল। কৃষ্ণেন্দুর এক সহকর্মী

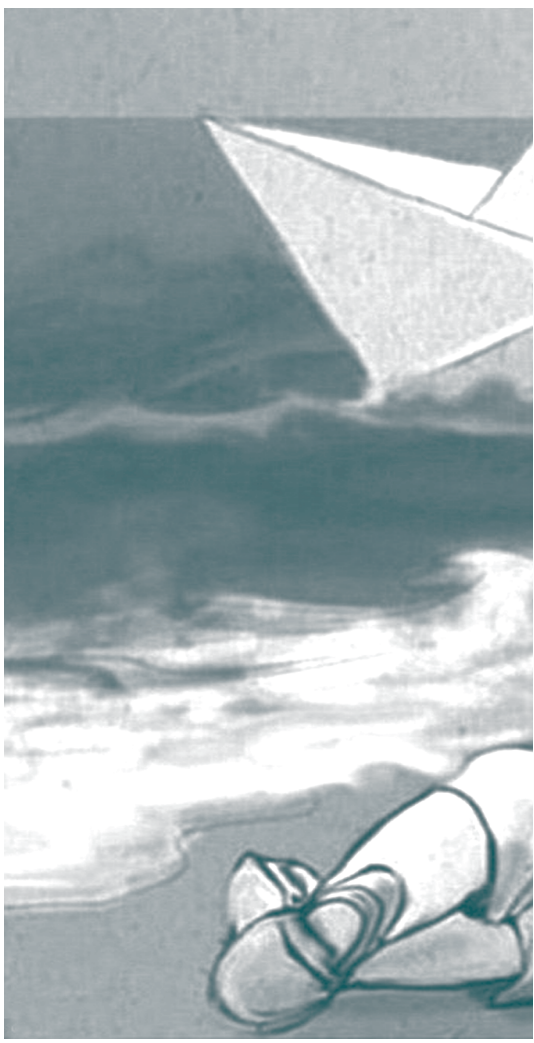

অসুস্থ। ও তাকে দেখতে গেছে। বুবিন ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দে সুতপা চমকে উঠল। ওর প্রথমেই মনে হলো বুবিনের কথা। বুবিন খাট থেকে পড়ে গেল না তো? প্রায় দৌড়ে বেডরুমে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সুতপা। না, বুবিনের কিছু হয়নি। তানপুরাটা দেওয়াল থেকে পড়ে দু'টুকরো হয়ে গেছে। বুবিন দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা তানপুরাটার পাশে।

তানপুরাটা যে কোনওদিন দেওয়াল থেকে পড়ে ভেঙে যেতে পারে সুতপা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। এখনও ওর বিশ্বাস হচ্ছে না। কতদিনের সঙ্গী! পরিমল কিনে দিয়েছিলেন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলে রাগ করতেন পরিমল। বলতেন, হারমোনিয়ামের আওয়াজটা বড়ো কৃত্রিম। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবের সঙ্গে মেলে না। তুই তানপুরা বাজিয়ে গান কর তপা। সুতপা তাই করত। বিয়ের পর সুতপা যাতে গানের চর্চা করতে পারে তার জন্য তানপুরাটা এ বাড়িতে এনেছিল। পরিমল মাঝে মাঝেই আসতেন। এসে বলতেন, একটা গান কর মা, শুনি। কতদিন তোর গান শুনি না। মারা যাবার দু'সপ্তাহ আগে এসে আবদার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা আজ একবার শোনাবি মা? সেই যে, চিরসখা হে...। শুনিয়েছিল সুতপা। সেদিনও সঙ্গী ছিল তানপুরাটা। আজ ওটা ভেঙে গেল। সুতপার মনে হলো পরিমলের প্রাণশক্তিতে ভরপুর হাসিটাই বুঝি হারিয়ে গেল আজ।

নিজের ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিল সুতপা। গরমকাল। ঘরের দু'টো জানলাই খোলা। হঠাৎ দমকা হাওয়ার ঝাপটায় ওর সম্বিৎ ফিরে এল।

চোখ পড়ল বুবিনের ওপর। খটকা লাগল সুতপার। বুবিনকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে বুবিন। কষ্টটা জোর করে গিলে ফেলে ছেলের পিঠে হাত রাখল সুতপা, তোর মাথায় পড়লে কী হতো বল দেখি!

জানা কথা বুবিন কিছু বলবে না। সুতপা ভেবেছিল কথা না বলুক অন্তত ইশারা-টিশারা কিছু করবে। তাও করল না। যেমন পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। সুতপা দেখল বুবিনের ঠোঁট কাঁপছে। চোখে জল। আদর করে বলল, তানপুরা ভেঙে গেছে তো কী হয়েছে সোনা! বাবা আবার একটা কিনে দেবে। এখন চলো এখান থেকে।

বুবিন গেল না। সুতপা হাত ধরে টেনেও ওকে একচুল নড়াতে পারল না। ওর চোখের সামনে এখন কার্টুনের দুনিয়া। লাল নীল হলুদ পাহাড়। কথা না জানা হাতি বাঘ গণ্ডার। কথা না বলতে পারা একাবোকা মানুষ। আর মাঝখানে একটা ভাঙা তানপুরা। ওর বন্ধু। ওর চিরসখা। কত কথাই তো হতো সারাদিন। আজও তো কথা বলবে বলেই দেওয়াল থেকে তানপুরাটা নামাতে চেয়েছিল বুবিন। ছোট্ট বুবিন। চার বছরের বুবিন। শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারেনি বন্ধুত্বের ভার।

বিধ্বস্ত বন্ধুর পাশে উবু হয়ে বসে পড়ল বুবিন। তারপর মায়ের মতো বাজাবার চেষ্টা করল। আর্তনাদ করে উঠল তানপুরা। সুতপা আঁতকে উঠে বলল, হাত কেটে যাবে বুবিন। চলে আয় বলছি।

এই প্রথম কোনও আওয়াজ নয়, ইশারা নয়, স্পষ্টতই দুটো শব্দ উচ্চারণ করল বুবিন, মা, গান!

সুতপা বিস্মিত। অপ্রত্যাশিত আনন্দে আত্মহারা। ছেলেকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরে বলল, বুবিন তুই কথা বললি? আর একবার বল।

তানপুরার তারে হাত বুলিয়ে বুবিন বলল, মা, গান।

দুটি মাত্র শব্দ। তাতেই কানায় কানায় ভরে গেল সুতপার মন। কান্না গোপন করে বলল, হ্যাঁ বুবিন গান। আজ আমি সারাদিন গান গাইব। বাবা আসুক।

কৃষ্ণেন্দু ফোন পেল কিছুক্ষণ পর। সুতপা বিশ্ব জয় করার উচ্ছ্বাসে বলল, তুমি কোথায়? শীগগির বাড়ি এসো। বুবিন কথা বলছে। ■

গ্রন্থ সমালোচনা

ছদ্ম-সেকুলারের বুকে শক্তিশেল

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

দেবাশিস লাহা দেশের ভিতরে ও বাইরে এক পরিচিত নাম। তিনি ইতিমধ্যে দ্রৌপদী ও অন্যান্য গল্প, জায়গা দাখিল, ঢেউ পলাশ বলিকা, ঘাসফড়িং ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্য জগতে সাড়া জাগিয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত অমৃতস্য পুত্রাঃ অন্যান্য গ্রন্থের মতো তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। অমৃতস্য পুত্রাঃ গ্রন্থটি মোট ২৮টি প্রবন্ধের সংকলন। আজকের ভারতে সেকুউলার রাজনীতি নিয়ে যে ভণ্ডামি চলছে তার স্বরূপ তিনি প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন। এবং এই স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তিনি সর্ব বিষয়ে বিশাল পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন যা পাঠকদের শ্রদ্ধা শুধু নয় বিস্ময়ও জাগায়। আমাদের দেশে ভণ্ডামির ধ্বজাধারী মুখ্যত বামপন্থীরা। তাদের সঙ্গে সঙ্গত দিয়েছে কংগ্রেসি ও মুসলমানরা। দেশ-বিদেশের এই বামপন্থীদের মুখোশ তিনি একটানে খুলে দিয়েছেন। কমিউনিস্টদের চোখে হিন্দুরা অচ্ছুত। তাই হিন্দুদের দোষের অন্ত নেই। দেশবিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু দেশ ত্যাগ করেছে। এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের মর্মন্তুদ বেদনার কাহিনি কমিউনিস্ট লেখক ও চিত্র পরিচালকরা সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েছেন। দেবাশিস লাহার প্রবন্ধ 'ঋত্বিক ঘটক বনাম পার্টিশন ট্রিলজি' না পড়লে কি জানতে পারতাম ঋত্বিক ঘটক কীভাবে তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে উদ্বাস্তুদের দেশভাগজনিত দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা এড়িয়ে গেছেন? আশ্চর্যের বিষয়, একদল ধান্ধাবাজ বুদ্ধিজীবী তাঁকে উদ্বাস্তুদের চিত্ররূপ দিয়েছেন বলে প্রচার করেছেন। 'যদুনাথই যখন ইতিহাস' প্রবন্ধে শ্রী লাহা দেখিয়েছেন মুসলমান শাসনাধীন ভারতে মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন বলে যদুনাথ সরকার, রমেশ মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকা উল্লেখ করেছেন। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে মুসলমান শাসনকালে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কাহিনি এতটুকু উল্লেখ করা চলবে না। 'জয় শ্রীরাম! জয় শ্রীরাম! ডিংকা চিকা ডিংকা চিকা!' এই গ্রন্থের একটি বিস্ফোরক প্রবন্ধ। সরস ভাষায় লেখক তীক্ষ্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে হিন্দু ধর্মের মূল সুর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ— নিছক অহিংসা ও আত্মহনন নয়। চৈতন্য, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুত্বকে আধ্যাত্মিক ধর্ম থেকে রাজনৈতিক ধর্মে উন্নীত করেছিলেন।

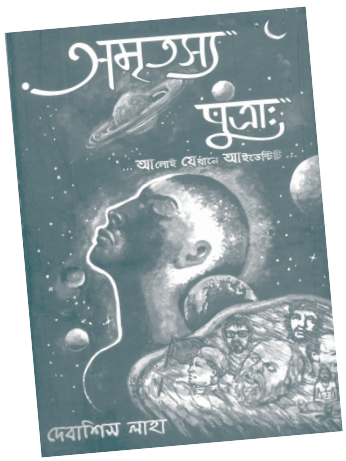

যাঁরা কমিউনিজমের বিরোধিতা করেছেন কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের মানবতা তথা প্রগতির শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন। হিটলাররের স্বৈরাচার কোনোমতে সমর্থন করা যায় না। কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে নিন্দা করতে গিয়ে লেনিন-স্ট্যালিনের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন। 'বুদ্ধিজীবী কারে কয়, সে কি কেবলই তৈলময়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন এঁরা এবং এঁদের সহযোগী কমরেডরা হিটলারের চেয়ে কম রক্তপিপাসু ছিলেন না— বরং বহুগুণ বেশি রক্তপিপাসু ছিলেন। লেখক শ্রী লাহা এইভাবে বামপন্থী চিন্তাধারার নিঃস্বতা তথা বিপদ দেখিয়েছেন।

'বামপন্থা এবং ইসলাম' প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন বামপন্থীরা মুসলমানদের সর্ব অবস্থায় সমর্থন করেছেন। মুসলমানদের পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, গণতন্ত্রবিরোধিতা, আলাদা শরিয়া আইন, তালাক, জেহাদ, মেয়েদের বোরখা পরা ইত্যাদির এতটুকু সমালোচনা করেননি। শ্রী লাহা জানিয়েছেন ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে বিরাট মিল আছে। মুসলমানরা যেমন কোরান অন্ধভাবে মেনে চলে তেমনি কমিউনিস্টরা অক্ষরে অক্ষরে ডাস কাপিটাল মেনে চলে; মুসলমানরা যেমন প্যান ইসলামিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে তেমনি কমিউনিস্টরা সারা বিশ্বে কমিউনিজম বিস্তারের স্বপ্ন দেখছে; মুসলমানরা যেমন ইসলাম ত্যাগ করলে তার জন্য মৃত্যুদণ্ড বিধান করে তেমনি কমিউনিস্টরা কমিউনিজম ত্যাগ করলে তাকে হত্যা করে, মুসলমানরা যেমন পরমত অসহিষ্ণু, তেমনি কমিউনিস্টরাও। লেখক মুসলমানদের সীমাহীন দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করেননি। এ কাজটি করলে ভালো হতো। যাই হোক, 'বিজ্ঞান : ল্যাবরেটরি বনাম প্রকৃতি' প্রবন্ধটিও বিস্ফোরক এবং গভীর চিন্তা-উদ্দীপক। ইসলাম অন্য ধর্মের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ 'প্রকৃতির মূল শিক্ষাটিই সে গ্রহণ করেছে, অনুশীলন করেছে। কী সেটা? যুদ্ধ এবং হিংসা, সংগ্রাম এবং লড়াই।' অহিংসা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ— আত্মরক্ষা তথা জাতিরক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর।

এরকমই দেবাশিসবাবুর অন্যান্য প্রবন্ধের পিছনেও আছে বলিষ্ঠ চিন্তা। কোথাও তিনি এতটুকু প্রচলিত পথে হাঁটেননি। তাঁর এই প্রবন্ধগুলি সময়োপযোগী এবং প্রতিটি চিন্তাশীল পাঠক ও কর্মীর পাথেয়। এই প্রবন্ধগুলি পড়ে পাঠকেরা নিজেই বুঝতে পারবেন হিন্দু তথা মুক্তমনা মানুষদের করণীয় কী। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মতো অনবদ্য। আমরা এমন গ্রন্থের সর্বাত্মক প্রচার কামনা করি।

পুস্তক : *অমৃতস্যা পুত্রাঃ*। লেখক : দেবাশিস লাহা। সুজন পাবলিকেশন, শলপ, হাওড়া, ২০১৯। মূল্য : ৩৫০ টাকা।

ওয়েসির সভায় ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান

ধীরেন দেবনাথ

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম) প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি আয়োজিত সিএএ বিরোধী এক প্রতিবাদ মঞ্চে উঠেছে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান। তখন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মিম নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েসি স্বয়ং। আর যে এই কুকর্মটি করেছে তার নাম অমূল্যা লিওন।

‘সেভ কনস্টিটিউশন’ নামের ব্যানারে আয়োজিত হয়েছিল ওই প্রতিবাদ সভাটি। নিজের বক্তব্য রাখার সময় ওই তরুণী একাধিকবার ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিয়েছে এবং সে এক পুরানো নকশালবাদী বলে খবরে প্রকাশ। মঞ্চে উপবিষ্ট ওয়েসি যথারীতি বাধা দেন এবং তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয় মাইক্রোফোন। পুলিশ অবশ্য তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং দেশদ্রোহিতা-সহ বিভিন্ন ধারায় তার বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে মামলাও। অবশ্য তার বক্তব্য, উদ্যোক্তাদের ডাকেই সে এসেছে।

মিম নেতা ওয়েসি আত্মপক্ষ সমর্থনের ত্রুটি করেননি। তিনি অমূল্যার বক্তব্যের শুধু বিরোধিতাই করেননি, করেছেন বক্তব্যের নিন্দাও। তিনি ওই তরুণীর সঙ্গে তাঁর দলের যোগাযোগের কথা অস্বীকার করেছেন। এমনকী, তিনি নিজেদের ভারতের পক্ষে এবং শত্রু পাকিস্তানকে সমর্থন করেন না বলে জানিয়েছেন। আরও জানিয়েছেন, ভারতকে বাঁচাতেই তাঁদের লড়াই। ‘ভারত জিন্দাবাদ রহেগা’— এমন কথাও বলেছেন তিনি। কিন্তু ওয়েসির কাছে প্রশ্ন, অমূল্যার সঙ্গে যদি তাঁদের দলের কোনো যোগাযোগ নাই থাকবে তাহলে সে মঞ্চে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেল কী করে? কী করেই বা তার হাতে এলো মাইক্রোফোন? তার বুকে ঝোলানো দলীয় ব্যাজটাই সে পেল কোথা থেকে? ওয়েসি সাহেব এসব প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন? ভারত-বিরোধী খেলা আর কত খেলবেন?

আসলে ওয়েসি সাহেব শাক দিয়ে মাছ

ঢাকতে চেয়েছেন। দলীয় সম্মতি না থাকলে ওই তরুণী সিএএ বিরোধী বক্তব্য রাখতে গিয়ে একেবারে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ বলে ফেলে কোন্ যুক্তিতে? সিএএ তো এখন সংবিধান সম্মত একটি আইন। তার বিরোধিতায় কেন পাকিস্তানকে টেনে আনা হবে? এটা তো সম্পূর্ণভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাহলে কি এ ঘটনার পিছনে পাকিস্তানের মদত আছে? উস্কানি আছে ভারত বিরোধী পাকপন্থী শক্তিগুলিরও? আর এসব প্রশ্ন যে অমূলক নয় তার প্রমাণ তো আমরা প্রতিদিনই পাচ্ছি। পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তো প্রতিদিন সিএএ, এনআরসি-র বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখছেন। আর সেই বক্তব্যের সুরে স্বর মিলিয়ে এদেশের বিরোধীরা, এক শ্রেণীর দুর্বুদ্ধিজীবী এবং পাকপন্থীরা সিএএ, এনআরসি বিরোধিতার ‘কোরাস’ গাইছেন, মোদী সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধ করছেন এবং একই কথার ফুলঝুরি ঝরাচ্ছেন। তবে একশ্রেণীর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের ধারণা, পাক প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব দরবারে মোদী সরকারের গৃহীত নীতির বিরোধিতার ইন্ধন জোগাচ্ছেন। কারণ মোদী সরকার ক্ষমতায় থাকলে ইমরান সরকারের সাড়ে সর্বনাশ। তাঁর রাজত্বে পাকিস্তান আর্থিক ভাবে দেউলিয়া, তাতে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার কারণে একমাত্র চীন ছাড়া প্রায় কোনো দেশই তাকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে না। বলতে গেলে চীনের কাছে পাকিস্তান এক প্রকার বিক্রি হয়ে গেছে। ভারত সীমান্তে পাকসেনা ও তাদের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের গোলাগুলি ও কাশ্মীরে অন্তর্ঘাত চালানোর অভিযোগ রয়েছে। পাকিস্তানে উন্নয়ন স্তব্ধ। দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁওয়া। জনগণ হারাচ্ছে ক্রয় ক্ষমতা। তাই ইমরান সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ ফুঁসছে। জনসমর্থনের পারদও নিম্নগামী। তাই ক্ষমতায় টিকে থাকতে এবং মোদী সরকারের পতন ঘটাতে ইমরান সরকার চীনের প্ররোচনায় ভারতের একশ্রেণীর বাম- সেকুলারবাদী ও ইসলামিক দলকে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যে মদত জোগাচ্ছে তা সিএএ এনআরসি বিরোধী গত ডিসেম্বরের কয়েকদিনের ভারতব্যাপী সমাজবিরোধী তথা দেশদ্রোহী দাঙ্গাবাজদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, দিল্লির শাহিনবাগে মুসলমান মহিলাদের মাসাধিককাল ধরনা ও প্রতিবাদ সমাবেশ, মিমের সভায় অমূল্যার ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান ইত্যাদি ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। তবে ওয়েসি যে ‘ধোওয়া তুলসীপাতা’ নন তা প্রায় সর্বজনবিদিত। তিনি ভারতের একশ্রেণীর মুসলমানকে যে দলে টানতে সিএএ বিরোধিতাকে হাতিয়ার করেছেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি দলীয় জনসভায় সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখতে অভ্যস্ত। নিজামের হায়দরাবাদকে তিনি আজও ‘ইসলামিক স্টেট’ বলে মনে করেন। তিনি হিন্দু বিদ্বেষী, পাকপ্রেমী।

এখন দেখার, অমূল্যা কাণ্ডে ওয়েসির হাত আছে কী নেই। বিগত বাম-সেকুলারবাদীদের রাজত্বকালে মুসলমান তোষণের ফলে এদেশে জেহাদি সাম্প্রদায়িক শক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে তো বকলমে ইসলামিক শাসনই চলেছে। কিন্তু হঠাৎ মোদী সরকার ক্ষমতায় আসায় তাদের বাড়াভাতে ছাই পড়েছে। তাই ‘মোদী হঠাও’ অভিযানে বিরোধীরা এককাট্টা হয়েছে। ■

ফঃ ৬

মরা ইঁদুরে ভাগ্য বদল

বহু বহু বছর আগে বোধিসত্ত্ব একবার এক বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব সৎ ও জ্ঞানী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনিও সবাইকে সৎ পরামর্শ দিতেন। একদিন তিনি কোথাও যেতে যেতে রাস্তার ধারে একটি মরা ইঁদুর

দেখতে পেলেন। ভাবলেন এই মরা ইঁদুর থেকেই কোনো পরিশ্রমী যুবক তার ভাগ্য ফেরাতে পারে।

কিছুদূর গিয়ে তিনি দেখলেন পথের ধারে এক যুবক বসে আছে, সে তার নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছে। বোধিসত্ত্ব তাকে বললেন, কাছেই পথের ধারে একটি মরা ইঁদুর পড়ে আছে, তুমি ওটার দ্বারাই তোমার ভাগ্য ফেরাতে পার।

যুবকটি এগিয়ে গিয়ে মরা ইঁদুটি তুলে নিয়ে বাজারের দিকে চলতে শুরু করল। পথে একজনের সঙ্গে তার দেখা হলো। সে যুবকটিকে বলল— ভাই, তুমি কি মরা ইঁদুরটি বিক্রি করবে? আমার একটি বিড়াল আছে, তাকে খাওয়াবো। যুবকটি এক পয়সার বিনিময়ে ইঁদুরটি বিক্রি করে দিল। তারপর যুবকটি আবার পথ চলতে শুরু করল। বাজারে গিয়ে এক পয়সা দিয়ে কিছু গুড় ও একটা বলতি কিনে তাতে জল ভর্তি করে জঙ্গলের পাশের রাস্তায় বসে রইল। জঙ্গল থেকে মালীরা ফুল সংগ্রহ করে ফিরছিল। তাদের খুব তেষ্টা পেয়েছিল। যুবকটি তাদের প্রত্যেককে গুড় ও জল খেতে দিল। তারা খুশি হয় তাকে একটি করে ফুল দিল। যুবকটি সেই ফুল বাজারে বিক্রি করে বেশ কিছু পয়সা পেল।

পরদিন সেই পয়সা দিয়ে আরও বেশি গুড় ও কয়েক বালতি জল নিয়ে ওই স্থানেই বসে রইল। সেদিন আরও বেশি সংখ্যক মালী যুবকের কাছ থেকে গুড় ও জল খেয়ে তৃপ্তিলাভ করে যুবককে একটি করে ফুলের চারা উপহার দিল। সে ওই চারাগুলি বিক্রি করে যে টাকা পেল তা একটা ব্যবসা করার পক্ষে যথেষ্ট।

সেদিন রাতে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হলো। ঝড়ের তাণ্ডবে রাজার বাগান তছনছ হয়ে গেল। সকালে বাগানের মালীরা ভেবেই পাচ্ছিল না যে তারা কীভাবে বাগান পরিষ্কার করবে। পরদিন যুবকটি তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। মালীদের সমস্যা শুনে সে বলল আমি বাগান সাফ করে দিতে পারি, কিন্তু সমস্ত ভাঙা ডালপালাগুলি তাকে দিতে হবে। মালীরা বিনা পয়সায় বাগান পরিষ্কার করা সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। তারা রাজি হয়ে গেল। যুবকটি বেশি পরিমাণে গুড় কিনে ও কয়েক বালতি জল নিয়ে পাশের গ্রামের কিছু ছেলেকে গুড় ও জল খাইয়ে বাগান পরিষ্কার করতে লাগিয়ে দিল। তারা মনের আনন্দে এক ঘণ্টার মধ্যে বাগান পরিষ্কার করে ডালপালাগুলো রাস্তার ধারে এনে জমা করে রাখল। এদিকে সেই এলাকার কুমোরদের কাঠ খড় শেষ হয়ে যাওয়ায় তাদর সংস্যা হচ্ছিল। তারা জ্বালানির সন্ধানে বেরিয়েছিল। রাস্তার ধারে জমা করা ডালপালা দেখে তারা মোটা টাকায় সেগুলি কিনে নিল।

কয়েকদিন পর যুবক আরও বেশি গুড় ও জল নিয়ে অন্য রাস্তার ধারে বসে রইল। সেই রাস্তা দিয়ে পাঁচশো ঘাসুড়ে ঘাস কেটে ফিরছিল। তারা গুড় জল খেয়ে খুশি হয়ে তাকে পাঁচশো আঁটি ঘাস দিল। সেদিন অন্য রাজ্যের এক বড়ো ব্যবসায়ী বহু ঘোড়া নিয়ে বাণিজ্য করতে সেই পথে যাচ্ছিল। তার ঘোড়ার জন্য ঘাসের খুব প্রয়োজন ছিল। যুবক সেই পাঁচশো আঁটি ঘাস বণিকের কাছে বিক্রি করে বহু টাকার মালিক হয়ে গেল।

এরপর ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফলে যুবকটি ধনবান হলো। তারপর খুঁজে খুঁজে বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে প্রণাম করে এল।

—সুরঞ্জন হালদার

ভারতের পথে পথে

মণিকর্ণ

পশ্চিমে বিষ্ণুকুণ্ড, উত্তরে হরেন্দ্র পর্বত, পূর্বে ব্রহ্মনালা, দক্ষিণ পার্বতীগঙ্গা– এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে মণিকর্ণ তীর্থ। মূল জনপদ রয়েছে পার্বতীগঙ্গার উত্তর তীরে। দক্ষিণে রয়েছে বাসস্ট্যান্ড। সেতুতে পরাপার করতে হয়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ মনে করা হয় মণিকর্ণকে। পুরাণকথায় আছে, দেব-দেবীদের বিবাহস্থল এই মণিকর্ণ। পুরাকালে এর নাম ছিল কুলিঙ্গপীঠ। এর পৌরাণিক আখ্যানটি হলো ঃ শিব ও পার্বতী বেড়াতে বেরিয়েছেন। এক সময় পার্বতীর কান থেকে মণিকুণ্ডল কোথাও পড়ে যায়। শেষনাগ সেটি নিয়ে পালিয়ে যায় পাতালে। সেটি ফিরে পাবার জন্য শিব কঠিন তপস্যায় বসেন। তপস্যার তেজে কেঁপে ওঠে ব্রহ্মাণ্ড। শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে সৃষ্টি হয়ে নয়নাদেবী পাতালে যান মণির খোঁজে। পাতাল থেকে মণি নিয়ে বেরিয়ে আসে শেষনাগ। শিবকে তুষ্ট করতে জলাভিষেক করেন। সৃষ্টি হয় এক প্রস্রবণের। বিশ্বের উষ্ণতম প্রস্রবণ এই মণিকর্ণ। গুরু নানকদেব আসেন মণিকর্ণে। রয়েছে গুরুদ্বারা। আছে মিনি বৈষ্ণোদেবী, হনুমান মন্দির, নয়নাদেবী মন্দির, কৃষ্ণ শ্রীমন্দির, শ্রীরামমন্দির।

জানো কি?

• মৌমাছির ৫টি চোখ। • মিডডে মিল শুরু করেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। • ত্রিপুরাতে কুকি উপজাতির বাস। • মানবদেহে জলের পরিমাণ ৭৫ শতাংশ। • মানব দেহের ক্ষুদ্রান্ত ৬ মিটার লম্বা।

• মানবদেহের ডান ফুসফুস আকারে বড়ো। • পায়ের নখ হাতের নখ অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। • প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহে গড়ে ৫ লিটার রক্ত থাকে।

ভালো কথা

গাছ বাঁচানোর বুদ্ধি

অক্সিজেনকে বলা হয় প্রাণবায়ু। তা আমরা পাই গাছের থেকে। তাই গাছ প্রাণীজগতের পরম বন্ধু। সাধারণ মানুষকে গাছের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে নানারকম উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরকমই এক উদ্যোগ নিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডার বাসিন্দা পরাগদূত মিশ্র। গাছ রক্ষার জন্য তিনি গাছের গায়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি এঁকে চলেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি এভাবে এক হাজারে বেশি গাছ বাঁচিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অনেক গ্রামবাসীই আবহাওয়ার পরিবর্তন কিংবা পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে সচেতন নন, তাই তারা নির্দ্বিধায় গাছ কেটে ফেলেন। তাদের এই কাজে বাধা দেওয়ার জন্যই আমি গাছের গায়ে দেব-দেবীর ছবি আঁকি। আমার এই পদক্ষেপ সফল হয়েছে।' তিনি বলেন, 'অনেক ছবি আঁকা গাছও কেটে ফেলা হয়েছে। তবে মানুষ এখন সচেতন হয়েচে। বিভিন্ন সংস্থা এই কাজে আমাকে সাহায্য করছেন। বিশেষ করে ছোটোরা এই কাজে এগিয়ে এসেছে।'

নূপুর চক্রবর্তী, দ্বাদশশ্রেণী, সি আর পার্ক, নয়া দিল্লি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) শ বে ন অ	(১) তি বি কৃ প্র দ্ধ রু
(২) রা গ পা পা	(২) ভ মি ল বি ছি ক্ষো

২৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) পয়সাকড়ি (২) ফেরিওয়ালা

২৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) হস্তান্তরযোগ্য (২) স্বজনবিয়োগ

উত্তরদাতার নাম

(১) আকাশ বাসফোড়, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (২) শ্রীপতি মুর্মু, ঝিলিমিলি, বাঁকুড়া। (৩) অভিজিৎ মহন্ত, মিলপাড়া, জলপাইগুড়ি। (৪) প্রকাশ মাহাত, নামোপাড়া, মানবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২৬।।

ডাক্তারজীর অসুখ বাড়ছিল। কার্যকর্তা ও ডাক্তাররা বললেন, রাজগীরে উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান করলে কাজ হবে। তাঁকে নিয়েও গেলেন রাজগীরে।

আপ্পাজী চলুন আমরা ডাক্তারজীকে রাজগীরে নিয়ে যাই।

সেখানেও ডাক্তারজীর সঙ্ঘকার্য চলতে লাগল। ওখানে দূর দূর থেকে আসা লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করতে এবং তাদের নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করতে লাগলেন।

ডাক্তারজী শুয়ে আছেন। স্থানীয় ছাত্ররা চাঁদা চাইতে এল। পরিচালক তেলঙ্গ তাদের ভাগিয়ে দিলেন।

১৯৪০ সালের ৩ মার্চ বিহার প্রদেশের কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি সঙ্ঘকাজের প্রসারের এক পরিকল্পনা করলেন।

আপনারা যান, ডাক্তারজীর সঙ্গে এখন দেখা হবে না।

আওয়াজ পেয়ে ডাক্তারজী জেগে উঠলেন। ছাত্রদের ডেকে তিনি তাদের সঙ্গে পরিচয় করলেন। বিকালে কী খেলাধুলা কর ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে তাদের চাঁদা দিলেন এবং স্নেহ সম্পর্ক গড়ে তুললেন।

এখানে শাখা খুলুন। এরাই স্বয়ংসেবক হবে।

জাগরণে সঙ্ঘ, নিদ্রায় সঙ্ঘ, স্বপ্নে সঙ্ঘ....

১৯৪০ সালটাও কি এমনি যাবে? এখন কত কাজ করার আছে। আমরা স্বাধীন হবই হবো।

চলবে

মহিলা উৎপাদকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত করতে চায় কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী হরসিমরত কাউর বাদল বলেছেন, জৈব খাদ্য উৎসবের মাধ্যমে মহিলা শিল্পোদ্যোগীরা আর্থিক ক্ষমতায়নের সুযোগ পান। নতুন দিল্লিতে সম্প্রতি তিনদিনের এই উৎসবের উদ্বোধন করে মন্ত্রী এই ধরনের মঞ্চের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়। তিনি বলেন, বিভিন্ন অঞ্চলের নির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রীর ওপর ভিত্তি করে সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরও ঘন ঘন এই ধরনের জৈব খাদ্য উৎসব আয়োজন করার পরিকল্পনা করেছে। শ্রীমতী বাদলের সঙ্গে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুবিকাশ এবং বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি। অনুষ্ঠানে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি এবং নারী ও শিশুবিকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। এই দুই মন্ত্রকের মধ্যে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের প্রেক্ষিতেই মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের জন্য এই জৈব খাদ্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীমতী বাদল বলেন, প্রতি বছর জৈব ক্ষেত্রে ভারতের বৃদ্ধির হার ১৭ শতাংশ এবং এই বৃদ্ধি যথেষ্ট দ্রুতগতিতে হচ্ছে কারণ সমাজের সকল স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণে এটি সাহায্য করছে। তিনি বলেন, সারা বিশ্ব স্বাস্থ্যকর ও ভালো খাদ্যসামগ্রীর খোঁজ করে এবং বড়ো বড়ো দেশগুলি ভারতের থেকে জৈব খাদ্য পাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী যা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নতির পক্ষে সহায়ক।

শ্রীমতী ইরানি বলেন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পমন্ত্রক এই ধরনের জৈব খাদ্য উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরি গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন যার ফলে মহিলা শিল্পোদ্যোগীরা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পমন্ত্রকের সচিব পুষ্পা সুব্রাহ্মনিয়াম বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে মন্ত্রক মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের সাফল্য তুলে ধরবে। তিনি বলেন, ভারতে খাদ্য ও পানীয় শিল্প পঞ্চম বৃহত্তম উৎপাদন শিল্প এবং ভারতই সর্বাধিক জৈব সামগ্রী উৎপাদন করে। ৬ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে আয়োজিত

এই উৎসবে ১৮০-র বেশি মহিলা শিল্পোদ্যোগী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা দেশের ২৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আসেন। এই উৎসবে এমন অনেক সামগ্রীর দেখা মেলে যা সহজে পাওয়া যায় না। অরুণাচল প্রদেশের কিউই, লাদাখের কালো গম ও পোস্ত সস, উত্তরাখণ্ডের চিয়া বীজ থেকে তৈরি কুকি এবং অ্যাপ্রিকট তেলের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক সামগ্রী এই মেলায় দেখা গেছে। এই মেলার লক্ষ্য লোকজন যেন বিভিন্ন রাজ্যের নানা ধরনের জৈব ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের স্বাদ পেতে পারেন।

দেশের প্রথম সারির গবেষণা সংস্থা যেমন, আইআইএফপিটি, এনআইএফটিইএম, সিএফটিআরআই, সিআইএফটি, ইনস্টিটিউট অব হিমালয়ান বায়োসোর্স টেকনলজি, সি-ড্যাক এই উৎসবে স্টল দেয়। এখান থেকে শিল্পোদ্যোগী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির খোঁজ পান। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্যের লক্ষ্যে ২০০-র বেশি বাণিজ্যিক বৈঠকের আয়োজন করেছে সিআইআই। বিখ্যাত পাচকরা মতবিনিময় অনুষ্ঠানে জানান যে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় কীভাবে জৈব সামগ্রী ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও, সফল মহিলা শিল্পোদ্যোগীরা তাঁদের সাফল্যের কথা এখানে জানান যা, কৃষকদের জৈব পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সহায়ক হবে। বিশ্ব জুড়ে ভারতীয় জৈব খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলারের সমতুল জৈব খাদ্যসামগ্রী ভারত থেকে রপ্তানি হয়েছে। তৈলবীজ, দানাশস্য, চিনি, ফলের ঘন রস, চা, মশলাপাতি, ডাল, শুকনো ফল, ঔষধি গাছের থেকে উৎপাদিত সামগ্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইজরায়েল, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, নিউজিল্যান্ড এবং জাপানে রপ্তানি করা হয়।

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুবিকাশ দপ্তরের সচিব রবীন্দ্র পানোয়ার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প দপ্তরের যুগ্ম সচিব রীনা প্রকাশ, এনআইএফটিইএম-এর উপাচার্য ড. চিন্দি বাসুদেবাপ্পা, সিআইআই-এর মহানির্দেশক চন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ■

জাতীয় কারিগরি বস্ত্র মিশন চালু করার প্রস্তাব অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে ১ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা খরচে জাতীয় কারিগরি বস্ত্র মিশন চালু করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এই মিশন চালুর উদ্দেশ্য হলো, কারিগরি বস্ত্র ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের অগ্রণী দেশে পরিণত করা। উল্লেখ করা যেতে পারে, জাতীয় কারিগরি বস্ত্র মিশন ২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত চার বছর ধরে রূপায়ণ করা হবে। কারিগরি বস্ত্র ক্ষেত্র সামগ্রিক বস্ত্র ক্ষেত্রের এমন একটি আধুনিক ও উন্নত রূপ যার ব্যবহার কৃষি ক্ষেত্র, সড়ক, রেল লাইন, খেলাধুলায় ব্যবহৃত পোশাক ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্র-সহ বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, অগ্নিনির্বাপণের উপযোগী জ্যাকেট, উচ্চ পার্বত্য এলাকায় জওয়ানদের বস্ত্রে, এমনকী মহাকাশ ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। এই মিশনের চারটি ক্ষেত্র রয়েছে। এগুলি হলো, গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন— এই খাতে ১ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে। উদ্দেশ্য হলো, কার্বন ফাইবার, অ্যারামিড ফাইবার, নাইলন ফাইবারের মতো বিভিন্ন ধরনের অসাধারণ প্রযুক্তিগত পণ্যের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা ও পরিচালনা। জিও টেক্সটাইল, অ্যাগ্রো টেক্সটাইল, মেডিক্যাল টেক্সটাইল, মোবাইল টেক্সটাইল এবং স্পোর্টস টেক্সটাইলের মতো ক্ষেত্রে প্রয়োগভিত্তিক গবেষণা তথা পরিবেশ বান্ধব কারিগরি বস্ত্র প্রযুক্তির বিকাশ।

সারা দেশে দশ হাজার কৃষি উৎপাদক সমিতি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারা দেশে দশ হাজার কৃষি উৎপাদক সমিতি গঠন করবে কেন্দ্র। সম্প্রতি চিত্রকূটে এই যোজনার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় কৃষকদের ৮৬ শতাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ভুক্ত। সাধারণভাবে যারা ১.১ হেক্টর বা তার থেকেও কম জমিতে কৃষিকাজ করেন তাদের ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষি বলা হয়। দেশ প্রযুক্তিতে এগিয়ে গেলেও উন্নত কৃষিপ্রযুক্তির কোনও সুবিধাই এরা পান না। কৃষি মরসুমে উচ্চগুণমানের বীজ, সার এবং কীটনাশকও এদের কাছে পৌঁছয় না। আর একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হলো কৃষিপণ্যের বিপণন। কেন্দ্রের কৃষি উৎপাদক সমিতি গঠনের ভাবনা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সাহায্য করার জন্য। সমিতিগুলি কাজ শুরু করলে তারা প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে কৃষিপণ্যের বিপণন পর্যন্ত— প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃষকদের সাহায্য করতে পারবে। এ বছর প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির বর্ষপূর্তি। এই প্রকল্পে কৃষকদের প্রতি বছর তিন কিস্তিতে দু' হাজার টাকা করে মোট ছ' হাজার টাকা দেওয়া হয়। এদিন প্রধানমন্ত্রী ২ কোটি কৃষককে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার অন্তর্ভুক্ত কিষান ক্রেডিট কার্ড দেবার কথা ঘোষণা করেন। ৮.৫ কোটি নথিভুক্ত কৃষকের ৬.৫ কোটি কৃষককে আগেই এই কার্ড দেওয়া হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে জম্মু-কাশ্মীর পুর্নগঠন আইন, ২০১৯-এর ৯৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রশাসিত ওই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগের ব্যাপারে নির্দেশ জারির বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে। ২০১৯-এর ৩১ অক্টোবর পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠিত হয়ে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০২৯-এর ৩১ অক্টোবরের আগে পর্যন্ত পূর্বতন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে সারা ভারতের কেন্দ্রীয় আইনগুলি কার্যকর হতো না। ওই তারিখের পর থেকে নবগঠিত কেন্দ্রশাসিত জম্মু এবং কাশ্মীরেও এই আইনগুলি প্রযোজ্য। যুগ্ম তালিকায় কেন্দ্রীয় আইনগুলিকে গ্রহণ করার জন্য পরিমার্জন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব রকমের অস্পষ্টতা দূর হলো।

জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন, ২০১৯-এর ৯৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী নব গঠিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে যে কোনো আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলির পরিমার্জন এবং গ্রহণ করার অধিকার কেন্দ্রের রয়েছে। মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে এ ধরনের ৩৭টি কেন্দ্রীয় আইন গ্রহণ এবং পরিমার্জন করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

পুলিশের তথ্যে দিল্লির হিংসা পূর্বপরিকল্পিত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সহস্রাধিক দুষ্কৃতী দিল্লির হিংসায় জড়িত ছিল। এদেরই দৌরাত্ম্যে দিল্লিতে দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পুলিশ এখনও পর্যন্ত

দু' হাজারের বেশি সিমিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করেছে। পাঁচশো অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। অজস্র হোয়াটসআপ মেসেজ পরীক্ষা করে পুলিশ মনে করছে এই হিংসা সম্পূর্ণতই পূর্বপরিকল্পিত। এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত এফআইআরের সংখ্যা ১২৩ এবং গ্রেপ্তার হয়েছে ৬৩০ জন। এই ঘটনার তদন্তের জন্য দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চের অধীনে দুটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। দুটি দলের নেতৃত্বে থাকবেন ডিসিপি জয় টিরকে এবং ডিসিপি রাজেশ দত্ত। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বি.কে সিংহ তদন্ত পর্যবেক্ষণ করবেন।

উহানে বন্দি ভারতীয়দের উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত উহানে ত্রাণ পৌঁছে দেবার জন্য ভারত বৃহত্তম সামরিক বিমান পাঠিয়েছে। ভারতীয়। যেসব জিনিস পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে আছে দস্তানা, সার্জিকাল মাস্ক ফিডিং এবং ইনফিউশন পাম্প। এইসব জিনিস

ওষুধপত্র-সহ নানারকম ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত। ফেরার সময় বিমানটি মহামারী-আক্রান্ত উহানে আটকে পড়া ১২০ জনকে ফিরিয়ে এনেছে। এদের মধ্যে ৮০ জন পাঠানোর জন্য চীন ভারতকে অনুরোধ করেছিল। এর আগে এয়ার ইন্ডিয়া দুটি আলাদা উড়ানে উহানে আটকে থাকা ৬৪০ জন ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে এনেছিল।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের কঠোর অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রসঙ্ঘে কঠোর অবস্থান নিল ভারত। স্পষ্ট জানিয়ে দিল ভারত চায় পাকিস্তান অবিলম্বে সন্ত্রাসে অর্থ জোগানো এবং দেশের ভেতর সমস্ত জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ করুক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৪৩তম অধিবেশনে ভারত তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে পাকিস্তান

অনেকদিন ধরে অভিযোগ করে আসছিল। তারই জবাবে ভারতের এই কঠোর অবস্থান। ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সন্ত্রাসবাদে ইন্ধন জুগিয়ে পাকিস্তান কাশ্মীরের উন্নয়নকে বানচাল করতে চাইছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে প্যারিসের ফাইনানসিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) পাকিস্তানকে ধূসর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়েছে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ না করলে আরও ভয়ানক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শব্দরূপ-১ (বিষয় অভিমুখ—রামায়ণ) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

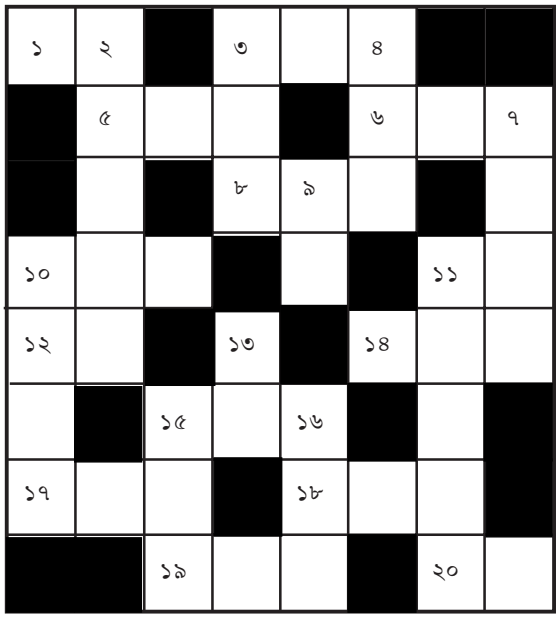

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. রামচন্দ্রের পিতামহ,
৩. 'উইটিপি'কে আর কী কহ?
৫. দেবতাদের গায়ক শ্রেণী,
৬. শ্রেষ্ঠ...মহৎ-বুঝি এমনই।
৮. অর্থটি এই সুন্দরী নারী,
১০. তপস্বী...মুনি—বলতে পারি।
১১. 'বার্ধক্য' যা শরীরে আসে,
১২. 'মনের গতি' বুঝবে কে সে।
১৪. 'জনয়িত্রী' মা-ই তো,
১৫. বানররাজ বালীর পুত্র।
১৭. দনু রাক্ষস--স্কন্দ-কাটা,
১৮. কৈকেয়ীর দাসী--কী নামটা?
১৯. মঙ্গল...শুভ—চাইলে পাই,
২০. 'পত্নী'-হলো সূত্রটাই।

উপর-নীচ : ২. জগদীশ্বর—করি প্রণতি!
৩. অসভ্য...মূর্খ...নীচ জাতি,
৪. কৌপীন-এ, ঠিক চিনেছি,
৭. রাজগৃহের রাজমহিষী,
৯. মন্দোদরীর দানব পিতা,
১০. তমোগুণ সম্বন্ধীয় যা,
১১. সীতার পিতা, রাজা মিথিলায়,
১৩. পর্বত-চূড়া পশুর মাথায়,
১৫. দশরথকে শাপ দিলেন কে সে?
১৬. শাসন...নিগ্রহ—লিখুন শেষে।

প্রেরণার পাথেয়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অর্থ—রাষ্ট্র সেবার জন্য নিজের প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ লোকেদের দ্বারা রাষ্ট্রকার্যের জন্য স্থাপিত সঙ্ঘ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের লোক নিজ রাষ্ট্রের সেবার জন্য এইরূপ সঙ্ঘ নির্মাণ করিয়া থাকে। এই প্রিয় হিন্দুস্থান আমাদের দেশ। এই পবিত্র হিন্দু রাষ্ট্র—আমাদের কর্মভূমি বলিয়া আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য এই সঙ্ঘকে আমাদের দেশে স্থাপিত করিয়াছি এবং ইহার দ্বারা আমরা রাষ্ট্রের সবদিক দিয়া উন্নতি করিতে চাই।

* * *

প্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার যে রাষ্ট্র শব্দের অর্থ কী? কোনো ঘন জঙ্গল, জলহীন মরুভূমি কিংবা কোনো নির্জন ভূভাগকে রাষ্ট্র বলে না। যে ভূভাগে এক বিশিষ্ট জাতির, বিশিষ্ট পরম্পরা-সম্পন্ন ও বিশিষ্ট চিন্তাধারার লোক বাস করে সেই ভূভাগকেই রাষ্ট্র বলে। তাহাদের নামেই সেই রাষ্ট্রের নাম হয়। এইরূপ লোকেদের হিতাহিত কল্পনা এক হওয়ার ফলে তাহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকারের একাত্মতার সৃষ্টি হয়। যাহাদের সংস্কৃতি আলাদা, চিন্তাধারা আলাদা, ইতিহাস আলাদা, কী ভালো কী মন্দ সেই সম্বন্ধে যাহাদের মনে পরস্পর-বিরোধী কল্পনা আছে, যাহারা পরস্পরকে শত্রু বলিয়া মনে করে, যাহাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ভক্ষ্য ও ভক্ষকের ন্যায় এবং যাহাদের একত্রিত থাকার কারণও এক নয়, সেইরূপ লোকের সমষ্টি মাত্রকে রাষ্ট্র নাম দেওয়া চলে না।

* * *

আমাদের নিজেদের ইতিহাসের ভিত্তিতে চিন্তা করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আজ আমরা ছত্রপতি শিবাজীর যুগে নাই। আজ আমরা এমন যুগে বাস করিতেছি যেখানে কেবল মানুষ কেন প্রত্যেকটি গাছেরও হিসাব রাখা হয়। আর প্রত্যেক রাস্তা মাপা হইয়াছে, মাইল হিসেবে নয়, ইঞ্চি হিসাবে। এই জন্য বাহিরের পৃথিবী হইতে চোখ ফিরাইয়া জীবন ধারণ পর্যন্ত অসম্ভব। তোমরা উৎসাহ গ্রহণ করো নিজেদের দেশের ইতিহাস হইতে। ইহার জন্য পৃথিবীর দিকে দেখিবার কোনো বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু অন্যান্য সব ব্যাপারে বাহিরের দিকে দেখা উচিত এবং পরিস্থিতি ভালো করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত।

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে)